KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 35 B Charu Avenue, Cal-33
Collection : KLMLGK	Publisher : Swapan Majumdar Kali Kumar Chakraborty
Title : অহংকার (AHANKAR)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 3/1 8/ winter Number 16/ Puja Number	Year of Publication : Feb- Apr 1976 Dec - Feb 1987-88 1996
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : Bhaswati Raychaudhuri	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অহংকার

॥ সম্পাদনা ॥

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

অষ্টম বর্ষ ॥ শীত সংখ্যা

পৌষ-মাঘ ॥ তের'শ চুরানব্বই

BENFED, THE FARMER'S FRIEND

BENFED is a familiar name among the farmers of Bengal. Through its hundreds of Primary Co-operative Societies and 14 District Offices, Benfed comes closer to the farmers to fulfill their needs.

Some of Benfed's Business Activities are :

* Distribution of Chemical Fertilisers, Quality Seeds and Pesticides
* Distribution of Pumpsets and Shallow Tubewell Accessories
* Marketing of Raw Jute & Jute Products
* Marketing of Vegetables, Pulses, Spices and other Agricultural Products
* Owner of the only Modern Rice Mill in West Bengal

The West Bengal State Co-operative Marketing Federation Ltd.

(BENFED)

Regd. Office : 6, GANESH CH. AVENUE, CALCUTTA-13

Business Office : 18, RABINDRA SARANI, (Poddar Court)

(Gate No. 3 & 4, 7th Floor)

CALCUTTA-700 001

অহংকার

অষ্টম বর্ষ ।। শীত সংখ্যা

পৌষ-মাঘ ।। তের শ চুরানব্বই

।। সম্পাদনা ।।

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

।। দপ্তর ।।

৩৫বি চারু এভিনিউ

কোলকাতা তেত্রিশ

অহংকার-এ প্রবন্ধ গল্প কবিতা নাটিকা অন্য রচনা বা আলোচনার জন্যে বই পাঠান :

অধ্যাপিকা ভাস্বতী রায়চৌধুরী

ইংরাজী বিভাগ পি. ডি. উইমেন্স কলেজ ডাক ও জেলা জলপাইগুড়ি

বা কোলকাতায় দপ্তরের ঠিকানায়

।। প্রবন্ধ ।।

নির্বাসিত ছন্দ ।। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

মানবী আচরণ ও বিশ্বাসের অহংকার

। শ্যামল বসু ।

।। উপন্যাস ।।

স্মৃতিবন্দী ।। ভাস্বতী রায়চৌধুরী

।। কবিতা ।।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত পূর্ণেন্দু পত্রী শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় রতেশ্বর হাজরা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাসুদেব দেব সুব্রত রুদ্র সুব্রত সরকার প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ অজিত বাইরী বিশ্বনাথ গরাই অচিন্ত্য নন্দী ঈশিতা ভাদুড়ী মতি মুখোপাধ্যায় শৌনক বর্মন সংযম পাল দেবী রায় সন্তোষ চক্রবর্তী গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রাখাল বিশ্বাস কল্যাণ রায় সঞ্জয় দে রণজিৎ দেব আনন্দ ঘোষ হাজরা আশুতোষ গোস্বামী ও সুকুমার চৌধুরী

।। গল্প ।।

শালিখ ।। উজ্জ্বল ঘোষ

।। কিছু কবিতা ।।

অশোক মণ্ডল এবং দেবপ্রসাদ মিত্র

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেন্স কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবি সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

৬০-এ, কলুটোলা স্ট্রীট (৩য় তল), কলিকাতা-৭০০০৭৩

রাজ্যের মৎস্যজীবীদের সঠিক উন্নয়নই এই সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া সামাজিক বিকাশ সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য চাষের প্রচলন এবং মৎস্য ধরার দ্রব্য সামগ্রীর যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই শীর্ষ সমিতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে চলেছে।

বিবাহে ও উৎসবাদিতে সুলভ মূল্যে মৎস্য সরবরাহ করা হয়।

শ্রী সমীর পালচৌধুরী
নির্বাহী আধিকারিক

শ্রীকিরণময় নন্দ, মৎস্যমন্ত্রী,
পঃ বঙ্গ সরকার, চেয়ারম্যান।

ছুটি নেই ▭ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কখনো কি টপকিয়ে যেতে পারবে এইসব অন্ধকার জমি ?
একটু দাঁড়াও, দ্যাখো, অনেকদিনের জলে ভ'রে গেছে সমস্ত আড়াল,
তুমি চ'লে যেতে চাইছো, চাইছো পাখা মেলে শূন্যে উবে যেতে,
কিন্তু তুমি তো মানুষ, কিছু হঁশ এখনো রয়েছে—কেন যাবে ?
যা কখনো এড়ানো যায় না, তাকে এইবার
পোষা ময়ালের মতো গলায় জড়িয়ে, সামনে হেঁটে যাও,
একটু অস্বস্তি লাগে, কিন্তু তার বেশি হয়তো নয়, এখন দাঁড়াও।
কখন গুঞ্জন ওঠে ? কারা আসে ? প্রপঞ্চের প্রহেলিকায়
আলো-অন্ধকার-ভরা পৃথিবীকে দীর্ঘদিন দেখেছো, এখনো
শুধু একটা জায়গা থেকে উঠে আরেকটা টুলের ওপরে ব'সে
দেখে নাও, হঠাৎ ঝাঁকিয়ে আজ বৃষ্টি এলো পশ্চিম-দক্ষিণ দিক থেকে।
ভেবেছিলে ছুটি নিয়ে চ'লে যাবে, হঠাৎ এমনভাবে যাবে
কেউ বুঝবে না—
চেনা দেয়ালের পাশে তবুও অনন্ত মাঠ প'ড়ে আছে, বুঝতে পারো নি।
কাদাজলে পায়ের চঞ্চল দাগ এলোমেলো হ'য়ে গিয়ে ঝাপসা হ'য়ে যায়।

আমরা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে
অরুণ মিত্রকে ▭ পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রণাম করব। কিন্তু পা কই ? আগুনে
ও হিমজলে পা ডুবিয়ে এখনো তো তাঁর অফুরান হাঁটা।
বরণ করব। কিন্তু কই সে শব্দদল যা ছুঁতে পারে তাঁর বোধের এলাকা ?
তাহলে ?
জ্বলন্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে শিখরের দিকে যাঁর এগিয়ে চলা,
অনুজের অভ্যর্থনা কীভাবে পৌঁছবে সে অগ্রজে ? তবে কি বিশেষণে-বোনা
স্তব-কোলাহলেই শেষ সে আরতি ?
না। ভীষণ নীরবে চাইব এই খবরটুকুই পৌঁছে দিতে শুধু—
আরো দীর্ঘতর প্রতীক্ষায় আমরা প্রস্তুত। আরো নতুনতর বিস্ফোরণের
আলোয় উত্তাপে আবীরে ঘোর লাল হয়ে উঠুক আমাদের প্রত্যাশার আকাশ।

আমরা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে।
তুমি মুখ ঘুরিও না। যজ্ঞাগ্নির সামনে কী দিব্য তোমার দহন।

এই মুহূর্তে আমার কাছে—রত্নেশ্বর হাজরা

নেই
দেবার মতো কোনো সমাধান
আমার কাছে নেই
কোনো জটিল গিঁট খুলে দেবার কায়দা

নেই
মাতাল হবার মতো কোনো আরক—যা
গলায় ঢাললেই ভোলা যায় দুঃখ নেই
তেমন কোনো সংসার—যার কাঁধে
পাথর চাপিয়ে হালকা হওয়া যায় একটু।

নেই
কার্পাস তুলোর মতো মেঘ এবং শাদা দিন
সরলবর্গীয় কোনো অরণ্য—কোনো নিষ্পাপ
তপোবন নেই
বধ্যভূমির দিকেও কোনো নিশ্চিন্ত পথ—
এমন কোনো নির্জনতা—যেখানে
বেড়াতে যায় শংখ এবং ঝিনুক।
নেই এমন কোনো গাছতলা—যেখানে
পচে যাচ্ছে না বকুল
এমন কোনো খেত—যার শস্য
নষ্ট করে না ইঁদুরের দঙ্গল।

নেই
এমন কোনো হাত যেখানে ভ্রষ্টতা লাগেনি
একটুও নেই
এমন রক্তের একটা বিন্দু—যার
চক্ষুর মণিতে জঙ্গলের ছায়া পড়েনি
কোনো দিন—

নেই
কণ্ঠ নালীতে ধারণ করার জন্য হিরের টুকরো বিষ

হাওয়ার কাছে বলে দিতে পারি এমন একটাও
মূল্যবান পাপ
নেই
বিছানায় শুতে দেবার মতো দামি
একখণ্ড আগুন

নেই
এমন এক বাটি জল
যার দিকে তাকিয়ে তৃষ্ণার্ত থাকা যায়
আমৃত্যু—

দগড়ে ঘা বাজা রঙ—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ দলমল হয়ে উঠছে হাতে হাতে।
দগড়ে ঘা বাজা রঙ, হাওয়া-ঘোরে ঘুর খাওয়া রঙ।
ঘোড়া সুদ্ধু উড়ে ওঠে চাবুক সোয়ার। কেউ সাক্ষী নেই।
মধু আশা করে ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটছে পাইক আর পতঙ্গ…

পরকলা এঁটে ছায়া ঠেস দিয়ে বসে বসে দেখছি।
নদী বান দিয়ে উঠল, হাওয়া-ঘোরে ঘুর খাওয়া ঢেউ—
ঘোড়া সুদ্ধু চাবুক সোয়ার যেন সাত রঙ অসি
কুহু রব করে উঠছে চার পাশ দলমল হয়ে—
কী জানি কী হয়! বোলে বোলে
পাতা বেজে বেজে ওঠে—সাত খণ্ড গাছ
উবু মুখে ভেসে যায় বান খাওয়া পথে…
পরকলা এঁটে ছায়া ঠেস দিয়ে বসে বসে দেখছি।
তালু চড়চড় করছে মধু তাপ।
জড়াজড়ি ভেসে যায় পাইক আর পতঙ্গ মন ঘোরে।
শিরায়-নলিতে রঙ, মুখ-বুক উবুঝুবু রঙ—
পাড় ডুবে যায়— মাটি, বোরো খেত, গাছে ঘেরা ঘর—

ছায়া পাক দিয়ে উঠছে— ছেঁড়া ফাটা তাপ।
দগড়ে দগড়ে উঠে উঠে আসে অতলের ধোঁয়া—
চার পাশ ঘিরে উঠল… ফের কোথায় যাব?
ঘোড়াকে পিয়োতে নেবে দাঁড়িয়েছে চাবুক সোয়ার…

মশারি — বাসুদেব দেব

বড় বেশি বানানো কথাবার্তা, শব্দ ব্যবহার
নিয়মমাফিক সব, এমনকি ঠোঁটের নিকট এই চায়ের কাপটিও
এইসব কিছু জড়িয়ে আছে মশারির মত আমাদের চৈতন্যে
এর মধ্যেই মশারি তুলে অকৃত্রিম মৃত্যুর আদর, লাইজলের গন্ধ…

তুমি সেই অসম্ভব সূর্যমুখী, কলকাতার ছাইগাদায় হঠাৎ
কেন যে ফুটে উঠলে, কোন আসবাব নও, শিল্পের চাতুরী নও
অভিজাত্যের আর্তনাদ কিংবা মৃত্যুর সম্ভাষণ নও আচমকা বৃষ্টি
এর মধ্যে তোমাকে কোথায় যে রাখি, হাতে বড় ধুলো বালি গো—

না, তোমাকে আমি খুচরো পয়সার মত আর রোজ
খরচ করবো না, জ্বালবো না দেশলাই কাঠির মতন
ছিঁড়বো না, খুঁড়বো না—কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট যেন
কোন ক্ষয় ক্ষতি মরণশীলতার অসম্মান—কিছুই তোমার নয় আজ—
সমুদ্রতীরের সূর্যোদয়, কুয়াশা বালির সঙ্গে জড়াজড়ি ঢেউ
দূর গায়ত্রীয় সুর, শহুরে বিছানা, মজা. মাদকের অফুরান গ্লানি
কত সহজেই তুচ্ছ করেছ, আমাকেও, এই রক্ত মাংসের সংক্রাম
তবে দণ্ড দাও, ফুটে ওঠো অসম্ভব, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সূর্যমুখী—

বানানো শব্দের স্তব দুহাতে সরিয়ে, ভাঙা কাচের ওপর
পা ফেলে পা ফেলে এসো সরাও মশারি, ত্বক, ভিজে মাটি মেধার আধার—

ঢেউশিশু — সুব্রত রুদ্র

জল যেখানে মাটিকে ছুঁয়েছে
ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ শিশুগুলি তীরের কাছে আসছে
হাত বাড়ালেই জড়িয়ে ধরার দূরত্ব
এইটে জীবন

দূরে আর কিছু দেখতে পাই
এই বঞ্চনা বড়ো কষ্টের
যতই মাটি আলগা থাকুক না কেন।

স্মৃতি বন্দী

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

একটু আগে টুকুনরা চলে গেল। টুকুন জয়িতাকে নিয়ে এসেছিল। খুব তাড়াতাড়িই বিয়ে করছে টুকুন। টুকুনের বয়স এই ফেব্রুয়ারীতে চব্বিশ হবে। টুকুন জয়িতাকে বিয়ে করবে। বিশ্বাস হয় না। সেদিনের টুকুন। টুকুন তাঁর প্রথম ছেলে। প্রথম সন্তান নয় অবশ্য। বিয়ের বছরখানেক বাদেই প্রথম সন্তান জন্মেছিল। মেয়ে, বাঁচেনি। তার বছর দেড়েক বাদে টুকুন জন্মায়। সাত আট বছর কেটে গেল। কত তাড়াতাড়ি। জীবনের প্রথম কুড়িটা বছর খুব দীর্ঘ। কত? কত বছর লাগে বড় হতে? একবার বড় হয়ে গেলে যেন তর তর করে বছরগুলো চলে যায়। পেছন ফিরে তাকালে তাই-ই মনে হয়। মনে হয় কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে এল। সাতাশ বছর কেটে গেল। বিশ্বাসই হতে চায় না। এখন একা। তিন বছর আগে বুবুনের বিয়ে হয়ে গেল। আর তার এক মাস সতেরো দিন পরে সমীর চলে গেল। সমীরের যাওয়াটা বড় আকস্মিক। একবারও মনে হয় নি এমন নিঃশব্দে শেষ হয়ে যেতে পারে। সমীরকে কোনো দিন তিনি তাঁর মানসিক আশ্রয় বলে ভাবতে পারেন নি। তবু এত কাছের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একটা মানুষ। তাঁর স্বামী। থাকাটাকে কোনোদিন তেমন আলাদা করে আনন্দের বলে বোঝেন নি। মনের অগোচরে পাপ নেই। বরং কখনো সমীরের না থাকাটা কল্পনা করে তিনি একধরনের স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করেছেন মনে মনে। কিন্তু এখন বুঝতে পারেন, না থাকাটা কষ্টের। সমীরের মৃত্যুতে তাঁর একা হয়ে যাওয়ার ভয়টা যেন আরো বেশী দাপাদাপি করে দিয়েছিল। বরং তেমন সচেতন ভাবে সেরকম করে কখনো নিজের মৃত্যুভয় অনুভব করেন নি। জানতেন পর্দার ওপারেই সে আছে। মাঝে মাঝে হাওয়ায় দুলে উঠেছে পর্দা। মনে হয়েছে, এই বুঝি সে এল। কিন্তু নিজের জন্য ভয় পান নি কখনো। ভয় যা করেছে, তা সন্তানদের জন্য। টুকুন বুবুনের জন্য। সমীরের জন্য ভয় পান নি কখনো। শুধু এই একটা ভয় চিরকাল ছিল। একা হয়ে যাওয়ার ভয়।

কোথা থেকে এই ভয়রা এসেছিল?

ছেলেবেলায় মা বাবাকে জড়িয়ে যে জীবন সেখানে এই ভয়টা থাকে না। মনে হয় মাকে হারানোর পর থেকে এই ভয়টা তাঁর বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

শেষ পর্যন্ত টুকুন চলে যাচ্ছে। যাবে তো একদিন জানতেনই। তবু ছাড়তে মন চায় না। গত সপ্তাহে যখন এসেছিল তখনই জয়িতার কথা বলেছিল। জয়িতাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, সে কথা জানিয়েছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, তোর পিসিদের তাহলে খবর দে, বুবুনকে জানা, আমি একা তো পারব না।

ওসব অনুষ্ঠান ফনুষ্ঠানের দরকার নেই। আমরা রেজিস্ট্রী করে ফেলব, তোমার আপত্তি আছে?

না, আপত্তির কি? তবে রেজিস্ট্রি করলেও তো একটা অনুষ্ঠান করতে হবে। নাহলে পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন কি বলবে?

আজকাল কেউ কিছু বলবে না। তুমি অত মাথা ঘামিও না।

তিনি একটুক্ষণ চুপ করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, আমাকে একবার দেখাবি না?

দেখাব না কেন? টুকুন মুখ টিপে হাসছিল। তবে দেখো, বোলো না যেন, পছন্দ হয়নি।

তা কেন বলব? তিনি একটু দুঃখ পেয়েছিলেন। আর আমাদের পছন্দ অপছন্দে কি যায় আসে! তোদের পছন্দ হলেই হল।

আর তোমাদের সময় ঠিক উল্টো ছিল, তোমাদের পছন্দে অপছন্দে কিছু যেত আসত না। মা বাবার পছন্দ হলেই হল। কি উদ্ভট।

সব নিয়মেরই ভালো মন্দ আছে, তিনি বলেছিলেন।

তা আছে, তবে আমাদেরটা বেশী ভালো। টুকুন জোর করেছিল। সে তুমি অস্বীকার করতে পারো না মা টুকুন সেবার যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল জয়িতাকে একবার নিয়ে আসবে এবাড়ীতে। এবার সঙ্গে করে নিয়ে এল। টুকুনের সঙ্গে জয়িতাকে অমন ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখে প্রথমটায় তাঁর যে ঠিক কি প্রতিক্রিয়া হল তা যেন তিনি নিজেও ঠাহর করতে পারলেন না। মেয়েটির মধ্যে কোথাও কোনো কিছুই তিনি খারাপ দেখছেন না। অথচ তিনি বুঝতে পারছিলেন মেয়েটিকে তাঁর ভালো লাগছে না। এই-ই কি সেই চিরকালের অধিকার বোধের লড়াই? তাঁর বুকের ভেতরে যেন কাঁটা ফুটছিল। টুকুন, তাঁর টুকুন, যাকে পেয়ে তিনি কুশলকে ভুলেছিলেন। এতদিন ধরে তাঁর জীবনের মানে ছিল টুকুন। তাঁর নিজস্ব টুকুন, অন্য একটি অচেনা মেয়ের স্বামী হয়ে যাবে এই চিন্তাটা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। যত ভাবেন মাঝে মাঝে চোখে জল এসে যায়। মাঝে মাঝে রাগ হয়ে যায়। কেন রাগ হয়? কার ওপর রাগ হয় বোঝেন না। কিন্তু বুঝতে পারেন

মাথার ভেতরে এক ধরনের রাগ কাজ করছে।

টুকুন কী জয়িতাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে? হয়তো যাবে। না-ও যেতে পারে। টুকুন, আমার টুকুন কি পারবে এতখানি নিষ্ঠুর হতে? সে কি জানে না, এতদিন ধরে জানেনি, তার মার কাছে সে কি! কতখানি! কিন্তু জয়িতার কাছে আমি কে? কিছু না। কুশলের মায়ের কি আলাদা করে কোন মূল্য ছিল আমার কাছে? কুশলকে পাওয়ার জন্য একদিন আমি কুশলের মায়ের স্বপ্নায়ু কামনা করেছিলাম। হা ঈশ্বর! আমাকে কি তার জন্য শাস্তি পেতে হবে?

টুকুন জয়িতাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে? তিনিও একদিন বাবাকে মাকে ভালোবাসতেন। তারপর কুশলকে। কুশলকে ভালোবেসে বাবাকে মাকে ছেড়ে যাবেন ভেবেছিলেন একদিন। তারপর অবশ্য কুশলকেই ছাড়তে হল। অথচ কে ভেবেছিল এমন হবে!

হোস্টেল থেকে ফেরার পথে ট্রেনে কুশল আর আমি। সে সব দিন যেন স্মৃতিতে এক একটা দ্বীপের মত ভেসে রয়েছে।

ট্রেনের জানালার ওপাশে শীতের নরম রোদ্দুর। কি কথা বলেছিলেন কিছু মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে কুশলের উজ্জ্বল সরল দৃষ্টি। কুশল কি বলছিল, মনীষা আমাদের সারা জীবনটা কি এই রকম শীতের রোদ্দুরে একটা নরম উষ্ণ দীর্ঘ ট্রেন জার্নির মত হতে পারে না? না, এরকম কথা কুশল বলে নি নিশ্চয়। কুশল এরকম কথা বলত না, মানে মুখে বলত না। তবে কি পাশাপাশি জানালায় মুখ রেখে তারা গেয়েছিল—

আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ। না, তা-ও নিশ্চয়ই নয়। এরকম গান তারা করত না। তবে কি কুশল বলেছিল—মনীষা, মনু সোনা। তোমাকে ছাড়া আমার বাকী জীবনটার কথা ভাবতেই পারি না। আর তখন তিনি বলেছিলেন, কুশল, আমার সারা জীবনের কুশল। না এরকম কথাবার্তা তাঁদের মধ্যে কখনো হয় নি। ঠিক কি যে করেছিলেন, কি যে বলেছিলেন মনে পড়ে না। তবে এটুকু মনে আছে, অনেক কথা বলেছিল কুশল আর মনীষা। মনীষা হয়তো তার কলেজের বন্ধুদের গল্প করছিল, জানো কুশল, এবার হোস্টেলে ফিরে দেখি, ঝর্ণা আসে নি, কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? ও মা, শুনি ঝর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে। সেই আসামে। অত ভালো ছিল পড়াশুনোয়, ওর খুব ইচ্ছে ছিল বি,এ.-টা অন্তত পাশ করে। খুব দুঃখ করে চিঠি লিখেছে আমাকে।

আর কুশল হয়তো বলছিল, আমাদের কলেজ থেকে এবার সাউথ ইণ্ডিয়ায়

এক্কাকার্সনে যাবে, আমিও যাব। যাবই ঠিক করেছি, যেমন করে হোক মাকে রাজী করাতে হবে।

এইরকম কথা বোধহয় তারা বলছিল। অথবা অন্যকিছু, অন্যকিছু কথা। কথা, শুধু কথা, অর্থহীন কথা, শুধু বলাতেই যার আনন্দ। শুধু কথা বলে সেরকম সুখ, সেরকম আনন্দ বোধহয় জীবনে বারবার পাওয়া যায় না। এক একসময় মনে হয়। কত দূরে, যেন অন্য জন্মের ঘটনা। আবার কখনো কখনো মনে হয়, কত কাছে, যেন সেদিনকার ঘটনা। কুশলের দীর্ঘ শরীর, ঈষৎ তামাটে রং, কপালের ওপর এগিয়ে আসা চুল, সব এত স্পষ্ট মনে আছে। স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু মুখটা মনে পড়ে না। এক একসময় মুখের এক একটা অংশ মনে পড়ে। কখনো তীক্ষ্ণ নাক, কখনো উজ্জ্বল ঈষৎ খয়েরী আভাস লাগা চোখ, কখনো বা সেই পুরুষালি ঠোঁট কপাল এবং চিবুক। কিন্তু সবটা মিলিয়ে পুরো একটা চেহারা মনে পড়েনা। বহুদিনই স্পষ্ট করে মনে পড়ে না। আর আজকাল তো কুশলের মুখ মনে আনতে গেলে টুকুনের মুখটাই চোখের ওপর ভাসে। কি আশ্চর্য! টুকুনের মুখে সমীরের ভাব খুব কম। বরং কেমন যেন কুশলের মুখের আদল আসে। সত্যিই কি তাই! নাকি কেবল তারই এরকম মনে হয়!

গত কয়েক বছর ধরে তিনি বুঝতে পারছেন, তিনি একা হয়ে যাবেন। খুব বেশী দেরী নেই আর। বাঘ যেরকম মানুষের গন্ধ পায়। তিনিও যেন সেই রকম অদৃশ্য একাকীত্বের অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলেন। বুবুনের বিয়ে হয়ে গেল আর তার পরে সমীরও চলে গেল। মৃত্যু যেন আড়ালে ওৎ পেতে থাকা বাঘের মত নিঃসাড়ে সমীরকে তুলে নিয়ে চলে গেল মনে হল। এমন আকস্মিক ঘটল ঘটনাটা।

বুবুনের বিয়ের জন্য তো তাঁর মনে একধরনের প্রস্তুতি ছিলই। মেয়ে তো। একদিন না একদিন কেউ এসে নিয়ে যাবে। তখন আর তার পরে কোনো অধিকারই থাকবে না।

খুব অবাক লাগত ব্যাপারটা অনুভবে আনতে অবশ্য, তবু বুঝতেন। শুধু টুকুন, টুকুনের কাছে তাঁর মন যেন ভিখারীর মত হাত পেতে থাকতে চায়। মুখে বলতে পারেন না। নিজের ছেলের কাছেও যেন কাঙালপনা করতে বাধে। কিন্তু যখনই টুকুন বাড়ীতে আসে তাঁর মন ঘুরে ফিরে বলতে চায়, টুকুন তুই থাকবি তো, কাল সকালে উঠেই বলবি না তো, মা তাড়াতাড়ি করো, আটটা পঞ্চাশের ট্রেনটা ধরতে হবে। তখন তিনি সিঁড়ির দরজা ধরে বিরস

মুখে দাঁড়িয়ে থাকবেন আর বলবেন, রাস্তায় দেখেশুনে চলিস, আমার বড় ভয় করে।

টুকুন ততক্ষণে রাস্তায় চলতে শুরু করে দিয়েছে। হাসিমুখে পেছন ফিরে তাকিয়ে বলবে, তোমার তো সব তাতেই ভয়। বলে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে টুকুনের দীর্ঘ শরীর। অতিরিক্ত শ্যাম্পু করার ফলে ঈষৎ লালচে হয়ে যাওয়া অগোছালো চুল। হলুদ রংএর সোয়েটারটায় ভারী মানায় টুকুনকে। সারা পুজোর ছুটি ধরে এই সোয়েটারটাই বুনেছেন টুকুনের জন্য। কুশল একবার একটা সোয়েটার বুনে দিতে বলেছিল। বুনে দিয়েছিলেন কি? কুশলকেও তাঁর বোনা সোয়েটার পরে একদিন হেঁটে চলে যেতে দেখেছিলেন? কুশল না টুকুন? না, কুশল? সারাজীবন ভরে কেন যে এত চলে যাওয়া? কম চলে যাওয়া দেখলেন না সারাজীবন ধরে।

টুকুন কি করবে কে জানে? টুকুন অবশ্য তাঁর কাছে খুব একটা গোপন করে না কিছু। বেশ কয়েকবার জয়িতার কথা বলেছে। যাদবপুরে রিসার্চ করে, নিয়ে আসব, দেখো। তিনি বলেছিলেন তুইও তো রিসার্চ করলে পারতিস। দূরে আমার ওসব ভালো লাগে না, তাছাড়া চাকরি তো একটা পেয়েই গেছি। এখন আমি শুধু যা খুশী পড়ব, লিখব, আড্ডা দেব। চিরকালই তো তুই তাই করেছিস টুকুন।

হ্যাঁ, আমার ওসব বাঁধাবাঁধি ভালো লাগে না জানাইতো।

জানেন বৈকি। তাঁর চাইতে বেশী কে জানে? তবু বলেছিলেন, রিসার্চটা করা থাকলে তোর চাকরিতে উন্নতি হোত, এই লাইনেই যখন ঢুকলি। এ কথায় টুকুন ভারী ঝরঝরে হেসে ফেলেছিল, মা তুমিও এইকথা বললে, ইচ্ছে করলে তুমি কম কিছু করতে পারতে না!

তখন আর টুকুন কিন্তু বলে না। পরে খেতে বসে বলে, আমি জানি মা তুমি পারতে, শুধু ইচ্ছে করোনি।

সত্যিই তিনি ইচ্ছে করেন নি। কেন ইচ্ছে করেন নি? এখন সেই দিনগুলোতে পিছিয়ে গেলে বুঝতে পারেন। সেই একটা সময় যখন এধরনের শূন্যতাবোধ তাঁকে গ্রাস করেছিল। চেষ্টা, ইচ্ছে এ জিনিষগুলো কেমন যেন ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাঁকে। ভালো স্ত্রী হতে চেষ্টা করেন নি। সমীরকে ভালবাসতে চেষ্টা করেন নি। চেষ্টা করেও একধরণের ভালোবাসা যায়। যেমন অনেক মেয়েই তাদের স্বামীদের একরকম করে ভালোবাসে। তাঁর ইচ্ছে করে নি।

সুনাম দুর্নাম সার্থকতা ব্যর্থতা কোনো কিছুরই যেন কোনো দাম ছিল না। বড় ছেলেমানুষ ছিলেন।

দূর আমার কথা বাদ দে, তোর জয়িতার কথা বল।

টুকুন লজ্জা পায়নি। হেসে বলেছে, হ্যাঁ, জয়িতাও পড়াশুনোয় খুব ভালো—বোধহয় আমার চাইতেও ভালো, আসলে ও নিজের বিষয় নিয়ে খুব পড়ে—আমার অত ভালো লাগে না—পৃথিবীতে কতকিছু আছে।

সত্যিই কতকিছুই আছে। কিন্তু তার কতটুকুই বা আমাদের পাওয়া হয়, জানা হয়! একটা বয়স পর্যন্ত মনে হয় হবে হবে। সব কিছুই হবে। গোটা পৃথিবীটাকেই নিশ্চয়ই একদিন দেখে ফেলব। তারপর একটা বয়স আসে যখন শুধু মনে হয়, কিছুই হল না। কিছুই তো হল না। তারপর সেই বয়স আসে যখন হওয়া না হওয়া আশা নিরাশা সব পার হয়ে যায় মানুষ। তখনকার বেঁচে থাকার স্মৃতিই প্রধান উপজীব্য। তিনি বোধহয় বড় তাড়াতাড়ি হওয়া না হওয়া আশা নিরাশা পেরিয়ে গেছেন ভেবেছিলেন, যেতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত। একজন কাউকে অন্তত একজন কোনো প্রিয় মানুষকে জড়িয়ে মানুষ হওয়া না হওয়া আশা নিরাশায় যাওয়া আসা করে। জীবন মানেই এই। আশা আর স্মৃতি। প্রথম ভাগ আশা বা বলা যায় দুরাশা। আর দ্বিতীয় ভাগ স্মৃতি। টুকুনের এখন প্রথম ভাগ চলছে। তিনি দ্বিতীয় ভাগে।

গত দুবছর ধরে আমার সেই ট্রেন জারনিটা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে যায়। এক একসময় এক এক রকম মনে হয়। কখনো মনে হয় আর কেউ ছিল না। শুধু আমি আর কুশল একা চলেছিলাম সেই ট্রেনের কামরায়। আর আমরা কেউ কোন কথা বলিনি। শুধু পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিলাম। কখনো মনে হয় আমাদের চারপাশে প্রচুর ভীড় ছিল। সুখী মানুষের ভীড় ছিল। তারা হাসছিল, গল্প করছিল। আনন্দ করছিল আর আমরা দুজনও যেন সুখে আনন্দে একেবারে পূর্ণ হয়ে ছিলাম। সুখে আনন্দে পূর্ণ হয়ে যেন আমরা ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমেছিলাম। কিন্তু তারপর? তারপর কি হল?

এই বাড়ীতে জানালায় বসা যায়। পুরোনো আমলের ১৮-ইঞ্চি গাঁথনির দেওয়াল। জানালায় চমৎকার বসার জায়গা করে রেখেছে। তিনি এই জানালায় বসতে ভালোবাসেন। জানালা দিয়ে একটা পার্ক দেখা যায়। যখনই অবসর পান ওই পার্কটা দেখাই তাঁর বিনোদন। আজকাল তো প্রচুর অবসর পান। টুকুন যখন থাকে, ওদের কলেজে যখন গরমের বা পুজোর ছুটি পড়ে সেই সময়টায় যা একটু কাজ। অন্য সময়ে কি-ই বা কাজ! স্কুলটা অবশ্য

ছাড়েননি, ধরে রেখেছেন। ভাগ্যিস রেখেছিলেন। নইলে এত সময় নিয়ে কি করতেন! একসময় একটু অবসর পাওয়ার জন্য মন আঁকুপাকু করত। পেতেন না। কত কাজ, টুকুন বুবুন তখন ছোট। সমীরের ছাত্রছাত্রী আসছে দলে দলে। সামনের ঘরটা তো তারাই দখল করে থাকত। সময় নেই। জায়গা নেই। সময়ের জায়গার অভাবে বড় অতিষ্ঠ অতিষ্ঠ লাগতো। সমীরের বাবা বেঁচে ছিলেন তখন। রাত্রে সামনের ঘরটা তাঁর দখলে চলে যেত। এ বাড়ীর সামনেই একটা যে একটা পার্ক আছে, আর সেখানে যে সকালে বিকেলে কত অজস্র রকমের মানুষের ভীড় হয় তা জানার অবকাশ ছিল না। এখন সময়ের অভাব নেই। জায়গার অভাব নেই। অভাব শুধু মানুষের। অভাব কাজের। এই অভাবটাই যে অনেক বেশী কষ্টকর তা তখন বুঝতেন না। বোঝবার কথাও না। এত অল্প জায়গায়, এত মানুষ জনের মাঝে বড় হাঁপ ধরে যেত। ছেলেবেলায় যে তিনি বড় খোলামেলা প্রান্তর ঘেরা বাড়ীতে বড় হয়েছিলেন।

এখন ছেলেবেলাটাকে মনে হয় অন্য কোনো জন্ম। এক সময় ছেলেবেলার কোনো কথা মনে পড়ে গেলে নিজের মনে নিজেই অবাক হয়ে যাই। সে কি এই জন্মে? সে কি এই আমির? সেই যে অনিমেষ কাকুর কাছে গান শিখতে যেতাম! কত গান। তখন আমার বয়স বোধ হয় নয় দশ। অনিমেষ কাকুই শিখিয়েছিল, এই জনমে ঘটালে কত জন্ম জন্মান্তর। কত বার বারে বারে একই লাইন ঘুরে ফিরে গাইতে হোত। সুর ভুল হোত। আবার ঠিক করে দিতেন। সেই নয় দশ বছর বয়সে এ গানের কোনো অর্থ ছিল না আমার কাছে। এখন মনে হয় কত সত্যি! কত সত্যি!

এ বাড়ীতে যখন প্রথম এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স তেইশ। সদ্য এম্ এ পাশ করেছেন। সমীর নিজের ছাত্রছাত্রী কলেজ সহকর্মী এইসব নিয়ে এত ব্যস্ত থাকত যে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যেত বৈকি। অথচ সংগোপনে অনেক সময় তিনি নিজের হৃদয় বিশ্লেষণ করে দেখতেন। সমীরকে কি আমি ভালোবাসতে পেরেছি! তাঁর হৃদয় বলেছে, না। সমীরের সঙ্গে বিয়েতে তাঁর হৃদয়ের সায় ছিল না। বিয়ের আগে ভেবেছিলেন, পালিয়ে যাবেন দূরে কোথাও কোনো চাকরি নিয়ে, কাউকে ঠিকানা না জানিয়ে। পারেন নি। কেন পারেননি? যদি পারতেন তাহলে কেমন হত তাঁর জীবন। কে জানে!

আমার হৃদয় কামনা করেছিল কুশলকে। স্পষ্ট মনে পড়ে—

বারান্দায় বাবার প্রিয় বেতের চেয়ারের সেট। বাবা একবার শিলিগুড়ি

থেকে ফেরার সময় বেতের চেয়ারের সেট নিয়ে ফিরলেন। নিজে হাতে রং করেছিলেন বাবা। উজ্জ্বল চকোলেট রং-এর বেতের এই সেটটা বাবা ভালোবাসতেন খুব। শীতের বিকেল। আশ্চর্য, আমার জীবনের সব দুঃখের ঘটনাই শীতকালে ঘটেছে। অথচ শীতকাল আমার সবচাইতে প্রিয় ঋতু। স্কুলে শীতকালের ওপর রচনা লিখে পুরস্কার পেয়েছি। কলেজের কবিতা প্রতিযোগিতায় শীতকাল নিয়ে কবিতা লিখেছি। শীতের বিলীয়মান রোদ্দুর তখনো এক চিলতে পড়েছিল বারান্দার একপাশে। কুশল চকোলেট রং-এর বেতের চেয়ারে এসে বসল। আমি উল্টোদিকের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম। আমার কোলে হলুদ উলের গোলা। আমি মার জন্য স্কার্ফ বুনছি। সেই স্কার্ফ হয়তো এখনো আলমারীর এক কোনায় পড়ে আছে। বুবুন মাঝে মাঝে গায়ে দিয়েছে। কুশল মুখ নীচু করে বসে আছে। বেতের সেন্টার টেবিলটার ওপরটা বাবা কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়েছিলেন। সেই কাঁচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কুশল। বিমর্ষ চিন্তাকুল। আমি উল কাঁটা চালাতে চালাতে কথাবার্তা বলছি।

তোমার মা কি বললেন?

মা কান্নাকাটি করছেন। কুশলের গলার স্বর খুব নীচু, প্রায় শোনা যায় না।

কেন?

মার ধারণা আমাদের বিয়ে হলে শুভ্রার আর কোন ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না। আসলে···। কুশল কথা শেষ করে নি।

আসলে কি?

অসবর্ণ ব্যাপারটা মার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। তবে আসলে আমার মনে হয় মা তোমাকে বা তোমাদের বাড়ীর কাউকেই পছন্দ করেন না।

কেউ কোনো কথা বলে না। শীতের বিকেল আর একটু পরে চুপ করে সন্ধে হয়ে নেমে আসবে।

তুমি কি করবে?

আমার মনে হয় আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

কতদিন?

অন্তত শুভ্রার বিয়ে পর্যন্ত।

রান্নাঘর থেকে কালোজিরে কাঁচালংকা দিয়ে আলুচচ্চড়ি রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসছিল। শীতের রোদের সঙ্গে মিলেমিশে সেই সুগন্ধ যেন এখনো

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির মত স্পষ্ট। মায়ের হাতের আলুচচ্চড়ি আর পরোটা খুব খুব প্রিয় ছিল কুশলের।

মা কুশলের সামনে পরোটা আর আলুচচ্চড়ি রেখে বললেন, খাও। তারপর একটু থেমে আমাকে বললেন, তোকেও একখানা দিই, দুপুরে তো ভালো করে ভাত খাসনি। কি যে তোদের ফ্যাশান হয়েছে? স্লিম হচ্ছেন সব··· না খেয়ে খেয়ে হাড় বার করা চেহারা হয়েছে। বলতে বলতে মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। ফিরে এলেন তাঁর জন্য খাবার নিয়ে। কুশলকে বললেন, এঁকে তুমি খাচ্ছো না কেন? খাও, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে স্বাদ থাকবে না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কুশল তো আবার কফি ভালোবাসে। আমার হাতে কফি তেমন উৎরোয় না। মনু কুশলের জন্য একটু কফি করবি নাকি?

কুশল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, থাক না মাসীমা, চা কফি কিছু লাগবে না।

মা আবার বললেন, যা না মনু।

থাক মাসীমা। আপনি চা-ই দিন। কুশল বলল।

আমি রান্নাঘরের দিকে উঠে গেলাম। ঘন সাদা দুধের মধ্যে কফি রং-এর কফি মেশাতে মেশাতে মনে হল—এখন ভাবলে কেমন নিজেকে পাপী মনে হয়—মনে হল, কুশলের মায়ের আয়ু কি আমাদের অপেক্ষা করার ক্ষমতার চাইতে বেশী হবে? চোখে জল আসছিল। মুছে ফেলেছিলাম। প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছিল, গেট বন্ধ করতে গিয়েছিলাম। চেরা বাঁশ দিয়ে তৈরী বাগানের গেট বন্ধ করার পর চলে যেতে যেতে কুশল পেছন ফিরেছিল। আমরা অপেক্ষা করব মনু, ভুলে যেওনা, ভুল কোরো না।

বাগান জুড়ে গাঁদা ফুল ফুটেছিল। মার নিজের হাতে শখ করে লাগানো গাঁদা ফুল। সেই শীতের সন্ধেতে অন্ধকার হয়ে আসা গাঁদাফুলের দিকে তাকিয়ে আমার মন ভারী হয়ে উঠছিল। একা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। মার গলা শোনা গিয়েছিল—মনু ঠাণ্ডা লাগাস না। চেরা বাঁশ দিয়ে তৈরী বাগানের গেটটাতে দড়ি বেঁধে বন্ধ করতে করতে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। দূর থেকে আবার মার গলা শোনা গেছিল, হিম পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা লাগাস না মনু।

ফিরে এসে আমি ঘরে আলো নিবিয়ে শুয়ে ছিলাম। অনিশ্চয়তা জনিত অবসাদ আমাকে চিবিয়ে খাচ্ছিল। কুশল বলে গেছে অপেক্ষা কোরো মনু, ভুল কোরো না। কতদিন? কতদিন অপেক্ষা? মা এসে ঘরে ঢুকলেন। কোনো কথা বললেন না। আস্তে আমার মাথায় হাত রাখলেন। মা, আমার মা।

তাঁকে আমি জন্ম থেকেই এমন জল হাওয়া বাতাসের মত পেয়ে এসেছি যে সেই পাওয়াকে কোনোদিন আলাদা করে অনুভব করিনি। সেই অন্ধকার মায়ের নীরব হাত যে আমাকে কি দিয়েছিল, কতখানি দিয়েছিল, তা যেন আজও বড় সুখের মত বড় দুঃখের মত আমার মনে পড়ে। আজও মায়ের কথা মনে হলে সেই অন্ধকার রাত আমার কাছে উঠে আসে।

কুশল কি বলল? অনেক পরে মা বলেছিলেন।

ওর মা রাজী নয় বুঝি?

মা, তার মানে, সবই জানেন। অথচ কত সহজ ব্যবহার করলেন কুশলের সঙ্গে।

মাকে আমার নতুন লাগছিল। আমার কান্না পাচ্ছিল, আমি বালিশে মুখ চেপে শুয়েছিলাম। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

তিনি ভেবেছিলেন অপেক্ষা করবেন। যেতে যেতে পেছন ফিরে কুশল বলেছিল, অপেক্ষা কোরো মনু, ভুল কোরো না। বাগান জুড়ে গাঁদা ফুল ফুটেছিল। মার নিজের হাতের শখ করে লাগানো গাঁদা ফুল। সেই মুহূর্তে কে জানত পরের শীতের আগেই সব কিছু অন্যরকম হয়ে যাবে। একেবারে অন্যরকম, মা তাঁর নিজের হাতের গাঁদা ফুল, তাঁর মনু, তাঁর শীতের স্কার্ফ, তাঁর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। কিছুই না জেনেও সেই শীতের সন্ধেতে অন্ধকার হয়ে আসা গাঁদা ফুলের দিকে তাকিয়ে তাঁর মন ভারী হয়ে উঠছিল।

মার চলে যাওয়াটা ছিল আকস্মিক। এক শীতের সন্ধ্যায় কুশল চলে গেলো। মাস দুয়েক পরে এক চৈত্রের বিকেলে মনীষা বাবার সঙ্গে বসে ডাকঘর পড়ছিল। এই এক খেলা ছিল বাপবেটির। মার হাতে তৈরি বাগানে বসে মনীষা বাবার সঙ্গে নাটক পড়ত। দুজনে মিলেই চরিত্রগুলো ভাগ করে নিয়ে পড়ে যেত, ইংরেজী বাংলা দুই-ই। বাবার উচ্চারণও খুব ভালো ছিল। বাবা মাঝে মাঝে মাকেও ডাকতেন, কইগো মাধুরী এ-দিকে এসো না। কোথায় কি কোরছ? তোমার কাজ আর শেষ হয় না। সারাদিন শুধু কাজ কাজ আর কাজ। কাজ ছাড়াও দুনিয়ায় আরো অনেক কিছু আছে। এই যে এত যত্ন করে গাঁদা ফোটালে, গোলাপ ফুটে উঠল একি শুধু আমরা দেখব বলে? তোমার এসব দেখতে ইচ্ছে করে না!

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মা এসে দাঁড়াতেন। বাবার হাতে দিতে দিতে বলতেন, হ্যাঁ তোমাদের জন্যেই এসব করা।

মাকে সেইসময় খুব সুখী সুখী দেখাতো। সত্যি মাকে কখনো সেরকম দুঃখী মনে হয়নি মনীষার। বরং বাবাকে মাঝে মাঝে দুঃখী মানুষ বলে মনে হত। এখন

মনে হয়, আসলে বাবার মধ্যে একটা অন্য মানুষ ছিল। ঠিক যেমন সে নিজের মধ্যে টের পায় আর একটা মানুষ আছে। চৈত্রের সেই বিকেলে যখন সে আর তার বাবা ডাকঘর পড়ছিল, চৈত্রের সেই মনোরম সন্ধ্যায় যখন সবকিছুই ভারী সুন্দর হয়ে উঠছিল, হয়ে উঠতে পারত……শুধু যদি কুশল থাকত। এই রকম নাটক পড়ার আসরে কতবার কুশল তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কুশল নেই, কুশলের কোন খবর নেই। স্থানীয় একটা ব্যাংকে কেরাণীর চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু ব্যাংকের চাকরি কুশলের ভালো লাগত না। তাই একটা ট্রেনিং নিতে কলকাতায় গেছে। বহুদিন কোনো খবর নেই কুশলের। একটা চিঠি এসেছিল, তাতেও একই কথা লেখা ছিল। অপেক্ষা কোরো, ভুল কোরো না।

সেই চৈত্রের সন্ধ্যায় তখনো তিনি জানতেন যে তিনি অপেক্ষা করবেন। মায়ের হাতের তৈরী বাগানে গোলাপ ফুটে উঠেছিল। ঠিক সেই সময় তিনি আর তাঁর বাবা চমকে উঠেছিলেন বাড়ির বহুদিনের পরিচারক গোপাল কাকুর চীৎকার শুনে –

বাবু দিদিমণি শিগগীর আসেন, মা ঠাকরাণ কেমন করতেছেন।

সেই মুহূর্তে তাঁর অজান্তে তাঁর একটা জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার হাসপাতাল –মাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় নি।

বাবা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে শুধু ডেকে উঠতেন। মনু,মনু মা কাছে গেলে কিছুই বলতেন না। বা শুধু বলতেন, একটু বোস মা। কাছে এসে বোস।

বাবা ভীষণ আঁকড়ে ধরেছিলেন তাকে। মাস ছয়েক কোথাও বেরোন নি। মনে হত যেন চোখের আড়াল করতে চাইতেন না তাঁকে, পলকে হারাই ভাব হয়েছিল একটা। মাস ছয়েক বাদে বললেন, মনু মা, চলো কিছুদিন কোথাও থেকে ঘুরে আসা যাক। সেই প্রথম দূরদেশে যাওয়া। গোটা দক্ষিণ ভারত ঘুরে এসেছিলেন। কোথাও তেমন মন বসে নি। শুধু কন্যাকুমারিকা খুব ভালো লেগেছিল। ভেবেছিলেন পরে আবার আসবেন। মনে মনে ভেবেছিলেন এর পর যখন আবার আসবেন তখন হয়তো সঙ্গে কুশল থাকবে। কল্পনায় কুশলের উপস্থিতি যেন সমস্ত স্নায়ু দিয়ে শুষে নিতে চেষ্টা করছিলেন। তারপর কতবছর, সাতাশ আঠাশ বছর কেটে গেল। আর যাওয়া হয়নি। হয়তো এ জীবনে আর হবে না। আমার মনের এক অংশ যখন ফিরে আসতে চাইছিল না, যে বাড়ীতে সর্বত্র মায়ের উপস্থিতির চিহ্ন সেই বাড়ীতে মা নেই, মা আর ফিরে আসবে না, কোনোদিন না, ভাবতে গেলেই বুকে শূন্যতা হু হু করে উঠত। সকালে ঘুমের মধ্যে মার

ডাক শুনতে পায় না। মনু, মনু ওঠ। সকালে রবীন্দ্রসংগীত তো হয়ে গেল, আর কখন উঠবি? ভাবা যায় না, কি কণ্ট!

অনেক পরে যখন সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন তখন তাঁর নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। সত্যি আমি অত দেরি করে উঠতাম! শত সহস্রবার মনু মনু মনু। আজকের রান্না ভালো হয় নি নাকি রে! কিছুই তো খেলি না, আবার দেখো বই মুখে নিয়ে বসেছে, যেমন বাপ তেমনি হয়েছে মেয়ে!

সত্যিই তাই। তাঁরা দুজনেই এই পৃথিবীতে কত যে আনাড়ী ছিলেন তা যেন তাঁরা নিজেরাও জানতেন না। মা না থাকা যে কি তা কোনোদিন কল্পনাও করেন নি। দুজনেই একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। ফেরার পথে ভুবনেশ্বরে পিসীর বাড়ীতে কয়েকদিন থাকব ঠিক হল। আর সেইখানেই পিসেমশাই-এর কিরকম দূরসম্পর্কের ভাইপো সমীরের কথা প্রথম শুনলেন। চমৎকার দেখতে, চমৎকার চাকরি করে। ছোট সংসার,বাবা আর এক বোন আছে। মা নেই ছেলের। শাশুড়ী সামলাতে হবে না মনীষাকে, এর চাইতে সুপাত্র আর কি হতে পারে? সদ্য মাতৃহারা মনীষা খুব অবাক হয়েছিল যে পাত্রের মা না থাকাটা একটা যোগ্যতা বা গুণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বাবা অবশ্য প্রথম শুনে এক কথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন। না, না অসম্ভব, এখন কিছুতেই আমার মনুর বিয়ে দিতে পারব না। সে যত সুপাত্রই হোক না কেন।

দাদা তুমি ভালো করে ভেবে দেখো পিসিমা বার বার বলছিলেন।

তোরা কি করে বলছিস ললিতা? বাবা বলেছিলেন। এখন মনুর বিয়ে দিলে আমি কি নিয়ে বাঁচবো? কাকে নিয়ে আমি বাঁচবো? পরে সেই বাবাই মত বদলালেন। সবাই বাবাকে চাপাচাপি করতে লাগল, বিয়ে তো আপনাকে দিতেই হবে শিশিরদা। পরে হয়তো এরকম সুপাত্র পাবেন না। তখন আফশোষ করবেন।

শেষ পর্যন্ত বাবা রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর মন ততদিনে চাইছিল ফিরে আসতে। কতকাল ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোন ঠিকানার ঠিক নেই। কত কাল কুশলের কোন খবর নেই। মায়ের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তার কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। মনে মনে তিনি খুব আশা করেছিলেন, ফিরে এসে চিঠি পাওয়া যাবে। পেলেন না।

পেলেন না, কেন যে পেলেন না! জীবনে যেমন অনেক প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না, তেমনি এটাও তাঁর আর কোনদিন জানা হয়নি। তাঁর চিঠি কি কুশল পায় নি? কুশল কি কোনো কারণে অভিমান করেছিল? সে কি তার

মায়ের ইচ্ছে মেনে নিয়েছিল? কে জানে কি! জানা হয়নি। কেন কুশল চিঠি দিল না? সারা রাস্তা মনে মনে ভেবেছেন, ফাঁকা ঘর, একেবারে ফাঁকা নয়। কুশলের চিঠি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। না পাওয়ায় শূন্য ঘর সহস্রগুণ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। হৃদয় বেদনায় দীর্ণ বিদীর্ণ হলেন। সেই সময়কার মানসিক অবস্থা এখনও তিনি স্পষ্ট মনে করতে পারেন।

সমীরের বাবা তাড়া দিচ্ছিলেন। তাঁরা দেরী করতে পারবেন না। বিয়ে দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিতে হবে। আর তখন বাবা বললেন, মনু, তুই অমত করিস না। কুশলের পক্ষে তার মাকে দুঃখ দেওয়া সম্ভব নয়। উচিতও নয়।

তখন তিনি ভেবেছিলেন অনেক দূরে কোথাও চলে যাবেন। এমন কি মৃত্যুর কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই করেন নি। বেঁচে থেকেছেন। সমীরের স্ত্রী হয়েছেন। টুকুন বুবুনের মা হয়েছেন। কুশলের বিয়ের খবরও পেয়েছিলেন। বাবার চিঠিতে কখনো কোনো খবর থাকত না। শুধু খবর জানতে চাইতেন। সেই সংবাদহীন চিঠিতে হঠাৎ এই খবর পেয়ে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেরকম যন্ত্রনার্ত হননি। যন্ত্রনা ততদিনে দুঃখ হয়ে গেছে। ততদিনে টুকুন বুবুন দুজনেরই জন্ম হয়ে গেছে। তারাই তাঁর সময়ের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে। একটি শিশুর দুধে-দাঁতের হাসি। একটি শিশুর টলমল হাঁটা যে তার জননীর কাছে কি আনন্দের হতে পারে তা আবিষ্কার করে বিভোর হয়েছেন। বাবা জানতেন তিনি কুশলকে ভুলতে পারেন নি, কোনদিন পারবেন না। তাই বোধহয় বাবা খবরটা জানিয়েছিলেন। কেন কুশলকে তিনি পেলেন না, কেন কুশল সরে গেল, কেন অপেক্ষা করল না, কেন অপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না-এইসব প্রশ্নের উত্তর যে তাঁর পাওয়া হয়নি। সেই কারণে এক ব্যক্তিগত অভিমান বহুদিন তিনি হৃদয়ে বহন করেছিলেন ঠিকই, সময়ে অভিমান ক্ষীণ হয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে তার তরুণ বয়স থেকে সরে এসেছেন। সরে যে এসেছেন, আসছেন তা সেই আসার সময়েই তিনি অনুভব করতেন।

তরুণ বয়সে তাঁর মনে হত,মা ঠাকুরমারা শুধু রান্না করে সন্তানের জন্ম দিয়ে সন্তান মানুষ করে যে জীবন কাটিয়ে যায় তা বুঝি নিরন্তর ভাবে দুঃসহ। কিন্তু টুকুন বুবুনের জন্মের পর বুঝতে পারলেন পুরোটাই তাই নয়। অন্য একটা দিকও আছে। একটা শিশুর বড় হয়ে ওঠার, তরুণ তরুণী হয়ে ওঠার, সর্বক্ষণের সঙ্গী হতে পারায় একধরনের আনন্দও আছে বৈকি। তখন সবে টুকুনের দুধে-

দাঁতের হাসি, টলমল হাঁটার আনন্দ এবং উত্তেজনা অনুভব করছেন। দু বছর আগে প্রথম সন্তান জন্মের মাত্র তিন মাস পরে মারা যায়। দ্বিতীয়বার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। প্রথম সন্তানের জন্ম ব্যাপারটাও সহজ হয়নি। কোথাও একটা কিছু গোলমাল ছিল তাঁর জরায়ুতে। তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, একটানা প্রায় চার মাস। সেই একবারই জীবনে সমীরকে অতটা অভিভূত হতে দেখেছিলেন তিনি। এমনিতে মনে হত সমীর একটু কঠিন ধাতুতে তৈরী। আবেগ-প্রবণতা জিনিষটা ওর কমই ছিল। পুরুষমানুষ বেশী আবেগপ্রবণ হলে সংসার চলে না। এই-ই ভালো, ভেবে সান্ত্বনা পেতে চাইতেন। তবু প্রথম প্রথম জীবনের প্রায় প্রত্যেক ঘটনায় সমীরের প্রতিক্রিয়া দেখে অনিবার্যভাবে তাঁর কুশলের কথা মনে পড়ে গেছে। মনে হয়েছে কুশল হলে এরকম করত না। কুশল হলে এরকম বলত না। ততটা অভিভূতই হয়েছিলেন যতটা তিনি কুশলের কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারতেন। তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর শরীর। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে আপনা আপনি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। চারধার ঘিরে রয়েছে ডাক্তার নার্স। যেন স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছে, কে যেন তাঁর ভেতরে হাতড়াচ্ছে। যন্ত্রনায় তিনি বোধহয় চীৎকার করে উঠেছিলেন। কেউ পাশ থেকে বলেছিল, প্রথম বার তো। কেউ বোধহয় বলেছিল, বাচ্চা পেটের ভেতরে বেঁচে আছে। একটানা চারমাস থাকতে হয়েছিল। প্রথমে কিছুদিন অনেক রোগীর সঙ্গে এক ঘরেই ছিলেন। তখন খুব খারাপ কাটে নি সময়টা। কিন্তু তারপর আরো সতর্কতার প্রয়োজন হওয়াতে তাঁকে একটা ঘরে আলাদা রাখা হল। সেই সময় হাসপাতালে বিছানাবন্দী অবস্থায় দুঃখ শব্দটার গভীর অর্থ যেন বুকের মধ্যে বিঁধে থাকত। বিছানা থেকে ওঠা বারণ, নড়াচড়া করা বারণ। কেউ নেই যার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, শুধু দুজন আয়া ছাড়া। একজন দিনের, একজন রাত্রের। সমীর সাধ্যের অতীত করে দুজন আয়া রেখে দিয়েছিল। তার জন্য তিনি মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। মনে আছে তখন অনুভব করতেন শুধু সুস্থ ভাবে সক্ষম ভাবে চলাফেরা করাই এক দুর্লভ আনন্দ। এমনিতে তিনি একটু দুঃখপ্রবণ ছিলেন। সহজেই দুঃখ পেতেন। বুকের মধ্যে যেন একসমুদ্র জল জমা থাকত। একটু নড়াচড়াতেই যেন চোখ থেকে জল ঝরে পড়তে চাইত।

বড় অভিমানী ছিলেন তিনি। সে বড় কষ্ট। সমীরের আবেগশূন্যতা অবশ্য খানিকটা প্রতিষেধকের কাজ করেছিল। অসহযোগী বাতাসের খর তাপে সেই অভিমান শুকিয়ে এসেছিল ইদানীং। সমীর কখনো তাঁর অভিমানে প্রশ্রয় দিত না বরং খানিকটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী ছিল। বড় দুঃখ পেতেন সেজন্য।

কিন্তু হাসপাতালে নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন যাপন করতে করতে তাঁর মনে হত, আর কখনো তিনি অত সামান্য কারণে দুঃখ পাবেন না। চার মাস হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে থাকা এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। প্রতিদিন ভোর হত বিকেল চারটের অপেক্ষায়। চারটের সময় ভিজিটাররা আসতে পারবে। ভিজিটার বলতে অবশ্য সমীর, বুলবুল আর সমীরের আত্মীয়স্বজনরা। হাসপাতালে বন্দীজীবন যাপন করতে করতে তাঁর মনে হত, আর কখনো তিনি অত সামান্য কারণে দুঃখ পাবেন না। মাঝে মাঝে রক্তের ফোয়ারা তাঁকে ভিজিয়ে যেত। ডাক্তার নার্স ভীড় করত চারধারে। একদিন প্রবল রক্তপাতের পর ডাক্তাররা আর অপেক্ষা করার সাহস পেলেন না। নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো দিন আগেই তাঁর সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার তোড়জোড় শুরু হল। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর সমস্ত পোষাক আশাক খুলে একটা সাদা পোষাক পরিয়ে দেওয়া হল। তাঁর মাথার ওপর অজস্র আলো নেমে আসছে তিনি বুঝতে পারছেন। তাঁর মুখে একটা মুখোশ পরিয়ে দেওয়া হল। তিনি শুনলেন এটাকে বলে গ্যাস মাস্ক। কালো রং-এর সেই মুখোশ, উজ্জ্বল আলো, ডাক্তারের হাতের ধারালো ছুরি, বিশাল ছুঁচ সুতো এই সমস্ত দেখতে দেখতে তাঁর চেতনা অবশ হয়ে আসছিল। মাথার কাছে এনাসথেসিস্ট দাঁড়িয়ে বলল, আমি এক দুই তিন চার গুনে যাবো। আপনি বলবেন শুনতে পাচ্ছেন কিনা। তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়···। দশ পর্যন্ত তাঁর চেতনাকে তিনি ধরে রাখতে পেরেছিলেন। তারপরই তাঁর চেতনা হাতছাড়া হয়ে যায়। সত্যি সত্যি অজ্ঞান হওয়া একটা আশ্চর্য অনুভূতি। জীবন থেকে, তাঁর সচেতন বেঁচে থাকা থেকে কতকগুলি ঘণ্টা পুরোপুরি বাদ চলে গেল। জ্ঞান হওয়ার পর প্রথম তাঁর মনে হয়েছিল, ঠিক যেমন গল্প উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের মনে হয় তেমন তাঁরও মনে হয়েছিল, আমি কোথায়? অস্পষ্ট তন্দ্রার মধ্যে শোনা কথার মতন অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর স্পষ্ট জ্ঞান হবার পর তাঁর প্রথম মনে হল, আমি তাহলে বেঁচে আছি! কি হয়েছে আমার, ছেলে না মেয়ে! বেঁচে আছে তো? জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পাচ্ছিলেন না। আর একটা প্রশ্নও মনের ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, স্বাভাবিক শিশু তো? এই একটা ভয় কেন জানি তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। প্রথম যখন ডাক্তারের কাছ থেকে জানলেন, সত্যিই সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য তাঁর শরীর প্রস্তুত হচ্ছে, প্রায় তখন থেকেই এই ভয় তাঁর বুকের ভেতরে নড়াচড়া শুরু করে দেয়। তারপর সেই ভয় আরো বেড়ে গিয়েছিল। যখন তাঁর নিজের শারীরিক অবস্থাই ভালো

থাকলো না তখন এই ভয় আরো বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বারবার ডাক্তার নার্সদের জিজ্ঞাসা করতেন, কোন অস্বাভাবিকতার ভয় নেই তো? তাঁরা সান্ত্বনা দিতেন, না, সেরকম কোন ভয় নেই, কিন্তু তিনি তবুও কিছুতেই সেই ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এখন স্পষ্ট জ্ঞান হওয়ার পর প্রথম তাঁর মনে হলো। আমি তো বেঁচে আছি। সে আমার অঙ্গের অঙ্গ, আমার সেই সন্তান বেঁচে আছে তো? ঠিক তখন সাদা পোষাক পরা নার্স ইনজেকশনের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হয়ে তাঁকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, এইতো জ্ঞান এসে গেছে দেখছি। কি হয়েছে আপনার জানেন তো?

তিনি মাথা নেড়ে ছিলেন। জানেন না।

নার্স তখন বলেছিলেন, মেয়ে হয়েছে আপনার, খুব সুন্দর মেয়ে।

নার্সের মুখে হাসি দেখে প্রথমেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ক্লান্তিতে দুর্বলতায় তখন চোখ বুজে আসছিল। তিনি চোখ বুজলেন।

সেই সন্তান বাঁচে নি, তিন মাস মাত্র। তিন মাস সে এই পৃথিবীতে ছিল। দ্বিতীয়বার জানলেন মৃত্যু কাকে বলে! শোক কাকে বলে! কাকে বলে নিরবধি শূন্যতা! হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে কাঁকিয়ে উঠতেন। সকাল হলে মনে হত, কেন সকাল হল? কি প্রয়োজন ছিল এই সকালের!

তার দুবছর বাদে টুকুন জন্মায়। দুটো বছর কেমন করে যে কেটেছিল! তখন তাঁর বিয়ের পর পাঁচ বছর হয়ে গেছে। অনেক দূরে সরে এসেছেন তাঁর সেই ছেলেবেলার তীর থেকে। শোক দুঃখ অভিজ্ঞতা তাঁকে অনেক রাস্তা করে দিয়েছে। কুশল, এমন কি কুশলকেও তখন অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়। টুকুনের দুধে-দাঁতের হাসি টুকুনের টলমল হাঁটা দেখতে দেখতে বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু সেই আনন্দ নিষ্কণ্টক নয়। শংকা কাঁটার মত বিঁধে থাকে আনন্দের গায়ে। তিনি যে ঘরপোড়া গরু! সমীর অত ভয় পেত না। সমীরকে তিনি কোনো দিনই ঠিক বুঝতে পারতেন না। মনে হত বুঝি উদাসীন। কখনো কখনো মনে হত নিষ্ঠুর। কখনো মনে হত স্বার্থপর। আসলে সমীর নিজের জগৎ নিয়ে থাকতে ভালোবাসত। ছাত্রছাত্রী পড়াত, পড়াশুনা করত। কখনো কখনো কোনো ছাত্রীর প্রতি কিন্তু বেশী মনোযোগও দেখতে পেতেন। তখন তাঁর ঈর্ষা হত। আশ্চর্য মানুষের মন তিনি তো খুব ভালোকরেই জানতেন তাঁর হৃদয় তিনি সমীরকে চেনেন নি? তবু কেন এই ঈর্ষা! নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতেন, কিন্তু ঈর্ষাকে অস্বীকার করতে পারতেন না। সমীরের হৃদয়ও যে তিনি পাননি। এটা যখনই অনুভব করতেন তাঁর খুব কষ্ট হত। কেয়া বলে সেই মেয়েটির কথা মনে

পড়লে এখন আর তেমন কষ্ট হয় না ঠিকই, কিন্তু তখন কয়েকটা মাস কি সংশয়ের যন্ত্রনার মধ্যে কাটিয়েছেন। অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পড়া ছাত্রীর অর্থনীতির অধ্যাপকের কাছে আসার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। কিন্তু কেয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ বা পক্ষপাতিত্ব তিনি অনুভব করতেন। সংশয় কষ্ট দিত। সবচাইতে অসুবিধা ছিল সমীরের সঙ্গে এ ব্যাপারে কিছুই আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। সমীর বাড়ীতে না থাকতে যখন কেয়া আসত, তখন তাকে অপেক্ষা করতে বলে মাঝে মাঝে তার পড়াশুনা, কলেজ, অনার্স পাঠক্রমের চাপ এসব নিয়ে আলোচনা করতেন। মনে মনে জিজ্ঞাসা করতেন, সমীরকে তোমার কেমন লাগে? কেয়াকে খুব চালাক মেয়ে মনে হত। সব কথাই বলত। শুধু যেন ইচ্ছে করে সমীরের প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলত। অবশ্য এস্ জি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। একটা মানুষ তার মা বাবার কাছে যা, স্ত্রীর কাছে তা নয়। স্ত্রীর কাছে যা, সহকর্মীদের কাছে বা তার কর্মক্ষেত্রে তা নয়। এসব তো তিনি জানতেনই। তবু সমীরের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সমীরের সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে ভালো লাগত। কেমন যেন অন্যরকম মনে হত। মনে হত এই যে একটা মানুষকে তিনি অত্যন্ত বেশী করে জেনে গেছেন, জানা তো আসলে একটা পুরো মানুষের একটুখানি অংশকে জানা। সমীর তার ছাত্রীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে, কেমন করে পড়ায়। এইসব তো কিছুই তাঁর জানা নেই। তাই ওদের মুখে সমীরের সম্বন্ধে শুনতে ভালো লাগত। কিন্তু কেয়া সম্পর্কে তিনি অস্বস্তিতে ছিলেন। তিনি খেয়াল করেছিলেন কেয়াকে সমীর অন্য ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াত না কখনো। কেয়াকে সব সময়ই অন্য সময় আলাদা সময় দেওয়া থাকত। সেটা হয়তো কেয়া ভাল ছাত্রী ছিল, তার সম্বন্ধে সমীরের উৎসাহ এবং আশা বেশী ছিল, তাই বেশী মনোযোগ দেওয়ার দরকার হত। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হত। হয়ত সত্যি নয়। তবু এই সন্দেহ তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে ভয় হত বুঝি বা এই সংসার ভেঙ্গে যায়। আর এ সব ভাবলে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়তেন। আশ্চর্য মানুষের মন,কুশলের প্রতি তাঁর অনুরাগকে তিনি সুগন্ধি স্মৃতির মত হৃদয়ে লালন করেছেন। অথচ সমীর সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান ছিলেন। অনেক রাত্রের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তিনি সমীরের পুরণো জীবন খুঁড়ে হৃদয় বেদনা টেনে বার করে আনতে চেয়েছেন। পারেননি। সমীরের সরস বিদ্রূপ সমস্ত কৌতূহলের মাথায় জল ঢেলে দিয়েছে। আমি বাবা অর্থনীতির ছাত্র, পরিষ্কার হিসেব নিকেশ বুঝি। তোমাদের মত অত সাহিত্য পড়িনি তো, মাথায় সবসময় রোমান্টিক পোকারা ঘুরঘুর করে না। তবে সমীর যাই বলুক

মনীষার চিরদিন মনে হয়েছে কোথাও একটা কিছু গোপন রয়ে গেছে। সমীরের এক বন্ধু একবার তার আড়ালে সমীরকে বলেছিল,যাই বলিস তুই কিন্তু বলিসনি, তোর মঞ্জরীকে সেদিন দেখলাম, সেরকম সুন্দরী আর নেই। তিনি শুনে ফেলেছিলেন কথাটা। তিনি নিজে সেরকম সুন্দর নন বলে অন্তর্গত হৃদয়ে একটা আক্ষেপ তাঁর ছিল বৈকি। এই কথাটা শোনার পর আরো বেশী করে মনে হয়েছে সমীর কি তাঁকে প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে তুলনা করে কিছুটা অবহেলা করে না? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কারণ সত্যিই তো সমীর কখনো তাঁকে স্পষ্ট ভাবে অবহেলা করে নি। কিন্তু আকাঙ্খিত মানসিক ঘনিষ্ঠতা কখনো ঘটে নি। চরম দৈহিক ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তেও মানসিক দূরত্ব রয়েছে অনতিক্রম্য। বহুকাল বাদে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন বেড়াতে তাঁরা। টুকুন বুবুনকে নিয়ে তিনি ট্রেনে বসেছিলেন। সমীর প্ল্যাটফর্ম-এ চা খাচ্ছিল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে হঠাৎ তিনি দেখলেন যথেষ্ট আধুনিক ভাবে সজ্জিতা একটি মহিলা থমকে দাঁড়াল সমীরের সামনে এবং অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল 'তুমি!' সেই স্বরে বিস্ময় ছিল, বিস্ময় ছাড়া আর যা ছিল তা বোঝা যায়, বলা যায় না। সমীরের মুখের রক্তোচ্ছ্বাস অস্বাভাবিক দেখতে লেগেছিল। যদি কোনদিন কোথাও কখনো কুশলের সঙ্গে দেখা হত তাহলে তিনিও হয়ত ঠিক এমনি করেই বলতেন, তুমি!

বুবুন অনেকদিন আসেনি। বুবুন,লালী। দেড় বছরের ছোট্ট লালী। বুবুনের মেয়েটা বুবুনের চেহারা পায়নি। ওরকম গোলমাল মিষ্টি চেহারা এ বাড়ীর কারো নয়। এ বাড়ীর সবাই কাটা কাটা ধারালো। সমীরের চেহারায় ধার ছিল, বুদ্ধিতেও ছিল। শুধু মায়ামমতা একটু কম ছিল। ওরকম ধারালো চেহারার লোকেরা বোধহয় একটু নিষ্ঠুর হয়। টুকুন বুবুনের জন্য তেমন যত্ন কখনো চোখে পড়ে নি। একেবারে ছোট ছিল যখন তখন মাঝে মধ্যে হঠাৎ একটু আধটু আদর করত। ওদের শখ সাধ চিরদিন তাঁকেই মেটাতে হয়েছে। ভাগ্যিস স্কুলের চাকরিটা প্রাণপণ চেষ্টায় চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কম তো বিপত্তি আসে নি সেইসময়। দুটো ছোট ছোট বাচ্চার অসুখ বিসুখ নিয়ে নাকাল হয়েছেন আর মনে মনে ভেবেছেন, আর নয়, আর পারছিনা। তবু শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন। ভাগ্যিস চালিয়ে গেছেন! টুকুন বুবুনই তাঁর জীবন, টুকুন বুবুন তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন। তবু একথাও সত্যি চাকরিটাও বেঁচে থাকার একটা অন্য ধরনের অবলম্বন বৈকি। একঘেয়েমি আছে, তবু প্রতিবছর উজ্জ্বল সরল শিশুদের তিনি না ভালোবেসে পারেন নি। প্রতিবছর পরীক্ষার খাতা নিয়ে যেমন হিমসিম খেয়েছেন, তেমনি প্রতিবছর পঁচিশে বৈশাখে যখন রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের

ভার পড়ত তাঁর উপর তখন উজ্জ্বল মেয়েগুলিকে দিয়ে নাটক করাতে করাতে তিনি কি আরো একবার নিজের অল্প বয়সের দিনগুলি খানিকটা অন্তত ফিরে পেতেন না? যা হারিয়াছে, যা আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না, সেইসব দিন এইভাবে অন্তত কিছুটা ফিরে পাওয়ার মূল্যেই কি জীবনে কিছু কম? কতবারের কত ঘটনার কথা মনে পড়ে। একবার মধুমিতা ডাকঘরের অমল হল, ওমা, যেদিন অভিনয় সেদিনই হঠাৎ মধুমিতা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর মা বাবা তো ওকে অভিনয়ের জন্য ছাড়তে রাজী নন। শেষে নিজে গিয়ে বলে কয়ে কোনো রকমে রাজী করাতে পেরেছিলেন। আর কি অশ্চর্য, সত্যিকারের অসুস্থ হওয়ার ফলে ও যখন অমলের অভিনয় করছিল তখন আর তা অভিনয় বলে মনে হয় নি। ওর ক্লাশের অন্য মেয়েরা ওকে অনেকদিন অমল অমল বলেই ডাকত। তেমনি আর একবার হয়েছিল, মেয়েদের দিয়ে শ্যামা নৃত্যনাট্য করিয়েছিলেন। অভিনয়ের দিন যে মেয়েটির শ্যামা-র গান গাওয়ার কথা ছিল, সে এসে আর পেঁছিয় না। কি চিন্তা! শেষটায় সবাই বলতে শুরু করল, মনীষা তুই কর গানগুলো।

মনীষাদি আপনি করে দিন।

তেমন তো প্রস্তুতি নেই। পারবেন কিনা খুব দুশ্চিন্তা হয়েছিল। যাইহোক শেষ পর্যন্ত পেরেছিলেন, সবাই খুব প্রশংসাও করেছিল। এইরকম কিছু কিছু আনন্দের টুকরো টুকরো স্মৃতির কি কিছু কম দাম জীবনে? টীচার্স রুমে টিফিনের সময়টুকুর স্বাদই কি ভোলা যায়? একটা জীবন ছেড়ে এসেছেন, আর একটা জীবনকে মানিয়ে নিতে পারেন নি। সেই সময়টায় এই চাকরিটাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। নাহলে বোধহয় সম্ভব হত না শেষ পর্যন্ত এই জীবনে স্থিত হওয়া। এমন দিনও গেছে যখন ভালো না লাগা তাঁকে নিরন্তর কাঁটার মতো বিধ করেছে। তিনি বুঝতে পারতেন সমীরের সঙ্গে তাঁর অমিলটা স্বভাবগত। সমীরের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। অন্তত সমীর নিজের কাছে একটা উদ্দেশ্য তৈরী করে নিয়েছিল। আর ছাত্রদের কাছে, তার সহকর্মীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়াই তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এবং এতে সে তৃপ্তি পেত। কিন্তু তিনি যে ঠিক কি চাইতেন তিনি নিজেও বুঝতেন না।

প্রথম প্রথম সংসারের কাজকর্ম তেমন করতে পারতেন না। কোনদিন তো করেননি। তিনি তাঁর বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে ছিলেন। সে কথাটা এ বাড়ীর কেউ একদিনের জন্যেও মনে রাখে নি। বিশেষ করে সমীর আর সমীরের বোন, ওরা যেন খবরটাই জানত না। সহানুভূতি, এই একটি জিনিষের জন্য তার প্রাণের ভেতরের প্রাণ যেন উন্মুখ হয়ে থাকত। অনেক অনেকদিন লেগেছে সহানুভূতি-

হীন আবহাওয়ায় সহজ নিঃশ্বাস নিতে। এ-ও ঠিক যে তিনিও বোধহয় তেমন করে নিজেকে দিতে পারেন নি। যেমন তিনি নিজেকে দিতে পারতেন বন্ধুদের কাছে, বা বাবার কাছে। তেমন সহজ হতে পারেন নি কোনোদিন সমীরের বোন সোনালীর সঙ্গে। সোনালীর সঙ্গে কোনদিন তাঁর বন্ধুত্ব হয়নি, অথচ হতে পারত কিন্তু তিনি তখনও জানতেন, এখন সেইসব দিনগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আরো বেশী করে বোঝেন, বন্ধুত্বের জন্য যা প্রয়োজন তা বয়স নয়, সহমর্মিতা। মা না থাকায় শুধু বাবা আর দাদার কাছে বড় হওয়া সোনালীর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা ছিল বলে তাঁর মনে হয়েছে। বহুদিনের দ্বিতীয় মহিলাহীন বাড়ীতে বৌদি নামক অন্য এক অপরিচিত মহিলার আবির্ভাব সোনালীর পক্ষে সুখকর হয় নি। প্রথমে সে চেয়েছিল উপেক্ষা করতে। মা না থাকার জন্যই হোক বা তার স্বভাবজাত প্রবণতার জন্যই হোক, সোনালীর সাংসারিক কাজকর্মে প্রশ্নাতীত নিপুণতা ছিল। এবং এই ব্যাপারটিতে তিনি ছিলেন ঠিক ততটাই অদক্ষ। স্বাভাবিক কারণেই সোনালী তাঁকে উপেক্ষা করেছিল। আড়ালে তার নাম দিয়েছিল ফুলটুসী। তিনি শুনেছেন সোনালী বন্ধুদের কাছে এই নামে তাঁর উল্লেখ করেছে। সোনালী একবার তার বন্ধুদের বলছিল, তিনি শুনে ফেলেছিলেন। অথবা তাঁকে শুনিয়েই বলা হয়েছিল।

আমার বৌদি বিয়ের আগে ফুলের গন্ধ শুঁকে বেঁচেছিল। তরকারী যে রান্না করে খেতে হয় জানত না। কথাটা বলার ভঙ্গীতে কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল ঠিকই, কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্যতাও যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি পড়াশুনায় ভালো ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভালো ছিল, ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর নাচগান শিক্ষার প্রতি মা বাবা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন। কলেজে শ্যামা হয়ে হাততালি কুড়িয়েছেন। তাঁর মতো চিত্রাঙ্গদা নাকি কলেজে আর কেউ হতে পারে নি কখনো। তখন কি ঘুনাক্ষরেও জানতেন যে বিবাহিত জীবনে এইসবের কোনো মূল্যই থাকবে না। শুধু বজ্রসেনের সঙ্গে শ্যামা কিংবা অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা হয়ে বিভিন্ন নাচের ভঙ্গীতে এ্যালবামে ছবি হয়ে জমা থাকবেন। এবং ক্বচিৎ এ্যালবামে উজ্জ্বল দীপ্তিময়ী পুরনো নিজেকে দেখে শুধু বিষণ্ণতার তীরবিদ্ধ হবেন। জীবনের প্রথম কুড়ি বাইশটা বছরে যা কিছু এত অর্থপূর্ণ, পরের বছরগুলোতে তাই-ই এমন অর্থহীন হয়ে যায়। তাঁর নাচ শেখার পেছনে কম সময় কম অর্থ ব্যয় হয় নি। এখনো মনে পড়ে সেই রবিবারের সকালগুলিকে। শীতের সকাল,বিছানা ছাড়তে একটুও ইচ্ছে করত না। একবার মা, একবার বাবা ক্রমাগত খানিকটা সময় অন্তর ডেকে চলেছেন।

ওঠো। ওঠো, মনুমা উঠে পড়ো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

মনু আর কত ঘুমোবি রে। বেলা কি কম হল নাকি ?

মনুমার ঘুম যে ভাঙ্গতেই চায় না, একটুখানি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসো তো।

ওঠরে মনু, দিন দিন বড্ড কুঁড়ে হয়ে পড়ছিস।

সকাল সাড়ে সাতটায় নাচের স্কুলে পৌঁছতে হত।

অত সকালে ঘুম থেকে উঠে রেডী হয়ে নাচের স্কুলে যেতে হত। তখনো শীতের কুয়াশা জড়ানো থাকত রাস্তায়। চেনা রিকশাওয়ালা গিরিকে প্রায়ই পাওয়া যেত মোড়ে। তিনি আর তাঁর বাবা রিকসায় উঠে বসতেন। শীতের হুহু হাওয়া কাঁপিয়ে দিয়ে যেত হাত পা। মা টুপি পরিয়ে দিত মাথায়। নাচের স্কুলে গিয়ে একটানে টুপি খুলে ফেলে দিতেন। মঞ্জুদি এলোমেলো চুলে হাত দিয়ে নাড়িয়ে বলতেন, আজও চুলের এই অবস্থা, মাকে বলবে সঙ্গে চিরুণী দিয়ে দিতে।

ভালো ঝিঙের ঝোল বা চালকুমড়োর ঘণ্ট রাঁধতে পারাটাও যে একটা গুণ এখবরই যেন তাঁর কাছে পৌঁছয় নি কোনোদিন। এই সমস্ত খাদ্যবস্তু এমন প্রশ্নাতীত অজটিলতার সঙ্গে তিনি পেয়েছেন যে এর প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে কোনোদিন তাঁকে মাথা ঘামাতে হয় নি। মা হয়তো মাঝে মাঝে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারতেন যে কোথাও একটা কিছু অভাব থেকে যাচ্ছে মেয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে। মাঝে মাঝে মা বাবার এরকম সংলাপ তাঁর কানে গেছে।

সর্বস্ব খুইয়ে খুব যে মেয়েকে নাচগান শিখিয়ে বিদ্যেধরী করে তুলছ, মেয়ে কি সিনেমায় নামবে ? এই মেয়ের তুমি পাত্র খুঁজে পাবে !

তোমার অত চিন্তা করতে হবে না। আমি ঠিক সেইরকম পাত্রে খুঁজে বের করব। তাছাড়া শুধু পাত্রের জন্যই কি মেয়েকে বড় করা ? ওর নিজের আনন্দ নেই ? আমাদের আনন্দ নেই !

করো তোমার যা খুশী। আমার কেমন ভয় ভয় করে, শেষ পর্যন্ত কিরকম বাড়ীতে পড়বে। হয়তো মানাতে পারবে না। মনে মনে কষ্ট পাবে, তবু মুখ ফুটে কাউকে বলবে না।

তোমার কোনো ভয় নেই। আমি মেয়েকে সেরকম ভাবেই তৈরী করব, যাতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে। মা বাবার এই জাতীয় সংলাপ তাঁর কানে গেছে কখনো সখনো। কিন্তু তখন এইসব বাক্যের অর্থ তাঁর বোধগম্য হয় নি। হওয়ার কথাও না। কারণ শৈশব এবং কৈশোর এমন একটা সময় যখন অভিজ্ঞতার কালো ছায়া দেখলেও চেনা যায় না। তিনিও চেনেন নি, চিনতে পারেন নি।

যতদিন না অদৃষ্ট এক ফুঁয়ে তার মাকে, তাঁর জীবনের আলো এবং আনন্দকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। 'অদৃষ্ট' এই শব্দটা যে কি অর্থবহ তা এইরকম এক একটা ধাক্কা এসে বুঝিয়ে দিয়ে যায়। এমনিতে তো শব্দটাকে ভাগ্যের প্রতিশব্দ বলে মনে হয়। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বার বার মনে হয়েছে যে অদৃষ্ট শব্দটার অর্থ কি তীব্র কি মর্মভেদী! অদৃষ্ট, যা দেখা যায় না, বোঝা যায় না, এমন কি এক মুহূর্ত আগেও অনুভব করা যায় না যে সে উপস্থিত হয়েছে। এক ফুঁয়ে জীবনের আলো আনন্দ নিবিয়ে দেবে বলে মুখ নীচু করেছে।

—তখন এসব আমি কিছুই জানতাম না। নাচগান পড়াশুনা নিয়ে আমি এক উজ্জ্বল জগতে বাস করতাম। সাংসারিকতার দৈনন্দিনতাকে যেখানে অত্যন্ত স্থূল বলে মনে হত। এখন অবশ্য তিনি অস্বীকার করেন না যে ভালো রাঁধতে পারাটাও একটা গুণ। আকাঙ্খিত গুণ। বুবুনকে তাই তিনি ছেলেবেলা থেকেই রান্না ঘরে ঢুকিয়েছেন। এ ব্যাপারে বরং সমীর মাঝে মাঝে আপত্তি করেছে।

ওইটুকু মেয়েকে দিয়ে তোমার রান্না করানোর কি দরকার? নিজে না পারো লোক দিয়ে করাও।

না, ও শিখে নিক। তিনি উত্তর দিয়েছেন, মেয়েদের ঘর সংসারে কাজকর্ম শিখে নেওয়া উচিত, নইলে পরে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে ধাক্কা খাবে।

সমীর তাঁর কথার অন্তর্নিহিত খোঁচাটুকু উপলব্ধি করেছে কিনা কে জানে। শুধু বলেছে—

কার জীবনে কি কাজে লাগবে আর কি লাগবে না আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। ওই তো সোনালী, অত ভালো রান্না বান্না জানত, তা ওকে তো আর রাঁধতেই হয় না। সেকথা সত্যি সোনালীর শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ীর দোর্দণ্ড প্রতাপ। রান্নাঘর শাশুড়ীর হাতে। সোনালী শখ করে রান্নাবান্নারও সুযোগ পায় নি বিয়ের পর প্রায় দশ বছর। সোনালীর কি দুঃখ!

—আমার এক একসময় মনে হয়েছে, সোনালী কি যে ন্যাকা দুঃখ করে। রান্নাবান্না করতে হয় না বেশ আরামেই তো আছে।

আর একটু বয়স হলে বুঝেছেন, সোনালীর দুঃখটাও নির্ভেজাল ছিল। সে যে কাজটা সবচাইতে ভালোভাবে পারে তার ইচ্ছে করে বৈকি প্রিয়জনকে তার আস্বাদ দিতে। তাছাড়া সব মেয়ের মধ্যেই বোধহয় রান্না করে স্বামী সন্তানকে খাওয়ানোর একটা ইচ্ছে থাকে, বিশেষ করে সন্তানকে। কিন্তু এসব তিনি বুঝেছিলেন টুকুন বুবুন খানিকটা বড় হওয়ার পর। ওদের আদর আবদার মেটানোর সময় যে

আনন্দ পেতেন, তাই বিশ্লেষণ করে করে। তার আগে বিশেষ করে বিয়ের আগে এসব অনুভূতি তার উপলব্ধির ত্রিসীমানায় ছিল না।

সত্যি কথা বলতে কি, প্রায় একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যে জীবন যাপন করেছেন সেখানে পড়াশুনো ছিল, গান ছিল, কবিতা পাঠ ছিল, নাটক ছিল। বাহিরের দিক থেকে দেখতে গেলে সেই জীবন ওই বয়স পর্যন্ত একটি ছেলের জীবন থেকে খুব আলাদা নয়। অনতিক্রম্য একটা প্রভেদও নিশ্চয়ই ছিল। ওই বয়সের একটি ছেলের জীবনের যা বিস্তৃতি সম্ভব তা তাঁর আয়ত্বাধীন ছিল না। কুশলরা একবার চার পাঁচজনে মিলে হৈ হৈ করে পুরী বেড়িয়ে এল। তাঁরও খুব ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু পারেন নি। বাবাকে তিনি বলেও ছিলেন, বাবা কুশলরা কেমন পুরী যাচ্ছে, আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে। তুমি তো আমাকে সমুদ্রই দেখাও নি 'দেখবে, নিশ্চয়ই।

দেখবে, 'বাবা বলেছিলেন। তোমার বয়সে আমিও সমুদ্র দেখি নি মনু। তোমাদের কলেজে যদি কোন এক্সকার্সন টার্সন হয়, তখন বোলো, আমি চেষ্টা করব তোমাকে পাঠাতে।

সে বছরই কলেজের এক্সকার্শনে পুরী যাওয়া হল। কিন্তু তাঁর যাওয়া হল না। তাঁর সে বছর জলবসন্ত হল। কি দুঃখ কি দুঃখ, অসুখের কষ্টের চাইতেও তাঁর বেশী কষ্ট হয়েছিল বেড়াতে যেতে না পারাতে। তারপর তো সেই সমুদ্র দেখলেন, পুরীও দেখলেন। কিন্তু তখন তাঁর জীবন পাল্টে গেছে। মা মারা যাওয়ার ছ মাস পরে সমুদ্রের তীরে বসে প্রথম বার সমুদ্র দেখার সময় তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠেছিল। জীবনে বার বার বহু বড় বড় ঘটনায় এমন কি তুচ্ছ ঘটনায়ও তিনি দেখেছেন, মানুষ যা ভাবে কে যেন অদৃশ্য হস্তে রসিকতা করে ভাবনা আর ঘটনায় মিল দিতে দেয় না। কখনো কখনো খুব ছোট্ট ছোট্ট ঘটনায় যখন তিনি এটা অনুভব করেছেন, তখন হাসি পেয়েছে। আর বড় বড় ঘটনায় চোখে জল এসেছে। এখনও পর্যন্ত প্রায়ই তিনি দেখেন, যেদিন তিনি টুকুন আসবে বলে অপেক্ষা করে থাকেন, তাঁর শরীর মন স্পর্শকাতর হয়ে থাকে যেন টুকুনের প্রতীক্ষায়, সেদিন টুকুন আসে না। হয়তো তার পরদিন আসে। তখন হয়ত তীব্র প্রতীক্ষার ব্যর্থতার পর একধরণের অবসাদ এসে গেছে। সেই বয়সে, সেই একুশ বাইশ বছর বয়সে এতটা বুঝতেন না।

—কুশলরা পুরী বেড়াতে গেল, আমি যেতে পারলাম না। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম বৈকি। তবু এইরকম কিছু বাধা বন্ধন সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমি আমার মা বাবার কাছ থেকে অনেকটাই স্বাধীনতা পেয়েছিলাম।

হয়তো সব মেয়ে পায় না। আমি পেয়েছিলাম। আমার সৌভাগ্য। কিংবা সব মেয়েই পায়। কমবয়সী সব মেয়েই এই মানসিক স্বাধীনতা পায়। যতদিন মেয়ে থাকে, পায়।

কিন্তু বিয়ের পর তিনি দেখলেন, তিনি যে লেখা পড়ায় ভালো সেটা যেন কোন খবরই নয়। তিনি যে ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন, কিছুটা নাচও শিখেছিলেন, এসব যেন তিনি নিজেই ভুলে গেলেন। শুধু তাঁর গান কিছুটা মনোযোগ পেয়েছিল। সমীরের বাবা যে কয়েক বছর বেঁচেছিলেন, মাঝে মাঝে বলতেন, মনীষা হার্মোনিয়ামটা নিয়ে একটু বসো তো।

সমীর অবশ্য ভালোমন্দ কিছু বলত না তাঁর গান সম্বন্ধে।

—বিয়ের কিছুদিন পর আমি জানতে চেয়েছিলাম আমার গান তার কেমন লাগে।

উত্তরে সমীর বলেছিল, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে তোমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। নইলে তুমি হয়ত বিখ্যাত গায়িকা অথবা একটা কিছু হয়ে যেতে পারতে।

এইরকমই কথাবার্তা বলত সমীর।

রসিকতার আড়ালে ঠিক কি যে বলতে চাইত বোঝা যেত না। রসিকতা এবং গাম্ভীর্য মিলে মিশে সমীরকে একটি দূরের মানুষ বলে মনে হত। আসলে তাঁর সঙ্গে সমীরের সম্পর্কটা ছিল ওইরকমই। চরম শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সময়ও যেন তাঁদের পরস্পরের চিন্তাস্রোত সমান্তরাল প্রবাহিত হয়েছে। একথা অবশ্য ঠিকই যে পরস্পরের শরীরের দ্বারা তাঁরা তৃপ্ত ছিলেন। চরম শারীরিক তৃপ্তির মুহূর্তে সমীর অনেক সময় বলেছে, এমন শরীর! এমন শরীর কটা মেয়ের আছে?

শুনে তিনি খুশী হতেন নিশ্চয়ই। শরীরের প্রশংসায় সব মেয়েই খুশী হয়। কিন্তু প্রতি রাত্রের দৈনন্দিন ক্ষুধা নিবৃত্তি ব্যাপারটাকে কিছুতেই অন্তর থেকে মেনে নিতে পারতেন না। তাৎক্ষণিক একধরণের শারীরিক আনন্দ উপভোগ করা সত্ত্বেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা চাপা বিতৃষ্ণা নিরন্তর কাজ করে যেত। গোটা শারীরিক ব্যাপারটা থেকে একটিই আনন্দজনক সুফল তিনি পেয়েছেন। তা হল, মা হওয়া। এই অভিজ্ঞতাটা একেবারেই ছিল না। তাই কোন প্রত্যাশাও ছিল না। এই আনন্দ তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিতই ছিল। অথচ ধীরে ধীরে কেমন করে জানি তাঁর সমগ্র অস্তিত্বই, না সমগ্র অস্তিত্ব নয়, তবে তাঁর অস্তিত্বের একটা বিশাল অংশ টুকুন বুবুনের মা হয়ে গেল। টুকুন বুবুন তাঁর

জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু সমীর তা হতে পারে নি। সমীর তাঁর জীবনে জোড়া লাগে নি। অথবা হয়তো উল্টোভাবে বলা চলে সমীরের জীবনে তিনি জোড়া লাগেন নি। মাঝে মাঝে নিজেকে বড় উপেক্ষিত পরিত্যক্ত মনে হত। চাকরিটাই ছিল অবলম্বন। টুকুনের জন্মের পর মাতৃত্বের আনন্দ আবিষ্কার করে বিভোর ছিলেন। সেই সময় একবার ভেবেওছিলেন চাকরিটা ছেড়ে দেবেন। চাকরি ছাড়ার প্রস্তুতি হিসেবে কিছু দিন ছুটিও নিয়েছিলেন। বছর দুয়েকের মাথায় বুবুন জন্মালো। তখন অসম্ভব ছিল চাকরিটা রক্ষা করা। বহু কষ্টে চাকরিটা টিঁকিয়ে রেখেছিলেন। সেই সময় সৌভাগ্যের মত পেয়ে গিয়েছিলেন বীণার মাকে। একটার পর একটা কাজের লোক চলে যাচ্ছিল। দু দুটো কচি বাচ্চার হ্যাপা তো কম নয়। এই অবস্থায় কিছুতেই কাজের লোক টিঁকতে চায় না। কি যে জ্বালা যন্ত্রনার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তখন। সমীর ক্রমাগত চাকরি ছাড়ার জন্য তাড়া লাগাচ্ছিল। সমীরের বাবা অসুস্থ। কিছু দিন আগে সোনালীর বিয়ে হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, দূর ছাই, ছেড়েই দি। সেই সময় সুমিতার পরামর্শ খুব কাজে লেগে গিয়েছিল। সুমিতা বলেছিল, মনীষা, এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন? ছেড়ে দেওয়া তো আছেই। যে কোন সময় ছেড়ে দিতে পারিস। ধরে রাখাটাই শক্ত। ছুটি নিয়ে নে, লম্বা ছুটি। দেখ কেমন লাগে। তাই-ই করেছিলেন তিনি। লম্বা ছুটি নিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম বেশ ভালো লাগত। কোনো তাড়া নেই। সব কাজ করতে পারছেন। বেশ ধীরে সুস্থে, গুছিয়ে। ঘুম না ভাঙ্গতেই ঘুম থেকে ওঠার অবসাদ নেই। টুকুন বুবুনকে অনেক বেশী সময় দিতে পারছেন। ততদিনে টুকুন খানিকটা বড় হয়ে উঠেছে। তার হাজার রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে কাজের সময় বিরক্ত হতেন। এখন ভালো লাগছে। কিছুদিন বাড়ীতে যেন খুব শান্তি। কিন্তু কয়েক মাস যেতেই বোঝা গেল সংসারে তাঁর চাকরিটা একেবারে অপ্রয়োজনীয় ছিল না, যেমন বলত সমীর বা সোনালী। সমীর তাঁর চাকরি করতে যাওয়াটাকে অনেক সময় উল্লেখ করত 'আড্ডা দিতে যাওয়া' বলে। সমীর ঠাট্টা করে যে কথাটা বলত, সেটা খানিকটা সত্যি ছিল ঠিকই। কিন্তু পুরোটা নয়। পুরোটা যে নয়, সেটা বোঝা গেল কয়েক মাস পরে। দিনকাল আর দিন দিন সুদিন থাকছিল না। জিনিষের দাম বাড়ছিল হু হু করে। সমীরের মাইনেপত্র কিছু বেড়েছিল ঠিকই। কিন্তু কোনও বাঁধা মাইনের আয়ই জিনিষপত্রের দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না। সমীরও তা বুঝতে পারছিল। টুকুনের জন্মের দুবছর বাদে

বুবুন জন্মাল। বুবুনকে ছ মাসের রেখে তিনি আবার স্কুলের কাজটাতে যোগ দিলেন। বাণীদি, রমাদি, সুনীতা, কাকলিরা হৈ হৈ করে উঠল। মনীষা তুই তাহলে ছাড়লি না তো ?

কাকলি বলল, কিরে সুনীতা, আমি বলেছিলাম না, মনীষা কিছুতেই চাকরি ছাড়তে পারবে না। শোন মনীষা, সুনীতার সঙ্গে আমার বাজি ধরা ছিল। সুনীতাটা বলে, ওর বর চাকরি করতে দেবে না তো ও কি করে করবে ? আমি বলেছিলাম, ঠিক করবে, চাকরির টাকাটা সংসারে না এলেই ওর বরের টনক নড়বে।

বুবুনের জন্য দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও আবার সেই সবাই মিলে টীচার্স রুমে হৈ হৈ, সবাই মিলে টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়ার আনন্দ ভালো লাগছিল। বীণার মা সেই সময় বুবুনকে খুব সামলেছে। বীণার মা দিনে দিনে প্রায় বাড়ীর লোকের মত হয়ে গেছিল। এ ব্যাপারে অবশ্য সমীরের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হত। সমীর সব সময়ই কাজের লোকদের সম্বন্ধে একটা দূরত্ব এবং কর্তৃত্বের মনোভাব রাখত। তিনি তা পেরে উঠতেন না। বীণার মাকে নিয়ে তো মতবিরোধ চরমে উঠেছিল। খারাপ লোক যে নেই, তা নয়। বীণার মার আগে পারুল বলে একটি মেয়ে কাজ করেছিল। খুব সেজেগুজে আসত। শরীরের চটকও ছিল খুব। আর তার যত কাজ ছিল দাদাবাবুর ঘরে। ছেলেটা বা মেয়েটা কেঁদে কঁকিয়ে গেলেও দেখতে আসত না। কিন্তু দাদাবাবুর কখন চায়ের দরকার, কখন জলের দরকার সে ব্যাপারে খুব পরিপাটি মনোযোগ ছিল। তিনিই পারুলকে ছাড়িয়েছিলেন। সমীর ব্যাপারটা পছন্দ করে নি। ছেলেদের বোধহয় এইধরণের হুজুরে হাজির কাজ কর্মের প্রতি একধরনের পক্ষপাত থাকে। বীণার মা ছিল সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। অথচ সমীর বীণার মাকে পছন্দ করত না। কি যে মুশকিল ছিল দুই পক্ষ সামাল দেওয়া। এখন মনে হলে হাসি পায়। এক একটা বিশেষ সময়ে এক একটা সমস্যা এমন ভার হয়ে ওঠে যে মনে হয় বুঝি বা তা জীবনের চাইতেও দুর্বহ। বেঁচে থাকা এমনই একটা আশ্চর্য জিনিষ। বেঁচে থাকলে একসময় সমস্যাই বেঁচে থাকার নীচে তলিয়ে যায়। কিন্তু সেই বিশেষ সময়টিতে তা কিছুতেই অনুভবে জানা যায় না। বীণার মার প্রতি তাঁর নিজের পক্ষপাতের অন্য কয়েকটা কারণও ছিল।

মেদিনীপুরে তার দশ বছরের মেয়ে এবং আট বছরের ছেলেকে তাদের দিদিমার কাছে রেখে এসেছিল বীণার মা,অনেক সময় কাজের ভুলের জন্য বকাবকি করার পর নিজেই অনুতপ্ত হতেন। ভাবতেন এরা বলেই পারে, কি করে পারে !

নিজের ছেলেমেয়ে কোথায় কেমন আছে, কচুশাক ঘেঁচুশাক সিদ্ধ খেয়ে পেট ভরাচ্ছে। আর তাঁর ছেলেমেয়েকে ডিমসেদ্ধটা পুরো খাইয়ে উঠতে পারে নি বলে বকাবকি খেয়ে মরছে। এক একসময় মনে হয়েছে, অন্তত একটা বাচ্চাকে এখানে নিয়ে আসতে বলবেন, পারেন নি। কারণ তিনি জানতেন সমীর কিছুতেই রাজী হবে না। সংসার তো তাঁর একার নয়, তাছাড়া মনে হয়েছে ওর নিজের ছেলেমেয়ে এখানে থাকলে কি ডিমসেদ্ধ বা কমলালেবুর রসটুকু পুরো টুকুন বুবুনের পেটে যাবে ! কিছুই করতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত, যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারেন না। শুধু কয়েকটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। মনে মনে জানতেন ওই কয়েকটা টাকা কিছুই নয়।

—বুঝতে পারছিলাম দিনকাল দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আমার নিজের সংসার চালাতেই খরচ বেড়েই চলেছে। আবার নিজের মনেই নিজেকে কৈফিয়ৎ দিয়েছি। আমার কি সাধ্য এত লোকের এত দারিদ্র্য ঘোচাই ! যতটুকু সাধ্যে যেটুকু সম্ভব। আমার নিজের সংসারের প্রয়োজনই তো দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

তিনি নিজে খুশী হন নি। কিন্তু আশ্চর্য বীণার মা খুশী হয়েছিল। নিজের পেট চালিয়ে ছেলে মেয়ের জন্য কিছু টাকা পাঠাতে পারছে,এতেই সে খুশী ছিল, আর মনে মনে দিন গুনত, কবে বীণা আর একটু বড় হবে। তাহলে তাকেও কাছাকাছি কোনো বাড়ীতে এনে কাজে লাগিয়ে দিতে পারবে। তবু তিনি কেমন যেন বীণার মার সঙ্গে একাত্ম বোধ করতেন। বীণার বাবা ছেলে মেয়ে বৌ ফেলে কোথায় চলে গিয়েছে জানা নেই। ছেলে মেয়েকে নিজের মায়ের কাছে রেখে বীণার মা কাজ করতে এসেছিল। একটু বড় হলে ছেলেটা হয়তো কোনো কারখানায় ঢুকবে বা কোনো চায়ের দোকানে। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক দিনেদিনে ক্ষীণতর হয়ে একদিন মিলিয়ে যাবে। শুধু বীণাই সম্বন্ধ রাখবে মায়ের সঙ্গে, মেয়েরা রাখে। এই মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা চমৎকার চালু আছে এদের মধ্যে।

যত কাজের লোক কাজ করেছিল তাদের মধ্যে বীণার মা-ই একটানা সবচাইতে বেশী দিন কাজ করেছিল। প্রায় সাত বছর তাঁর কাছে ছিল। বীণাকেও আনিয়ে নিয়েছিল। কাকলির বাড়ীতে তিনিই বীণার কাজ ঠিক করে দিয়েছিলেন। কাকলি চমৎকার মেয়ে। তিনি জানতেন কাকলির কাছে বীণা ভালো থাকবে। কিন্তু কাকলি বেশীদিন বীণাকে রাখতে পারে নি। বীণার নাকি হাতটান অভ্যাস ছিল। অসম্ভব নয়। তাঁর কাছেও এরকম দুএকটি মেয়ে কাজ করেছে, শোভা বলে একটি মেয়ে ছিল কাজকর্মে চমৎকার দুরন্ত, কিন্তু ঘরে কোনো খাবার দাবার রাখা যেত না। আসলে তিনি বুঝতেন, এদের ন্যায় অন্যায় বোধ তাঁদের সঙ্গে মেলে

না। প্রচণ্ড অভাব থেকে প্রাচুর্যের মধ্যে এসে নিজের প্রয়োজন মেটানোটাকে এরা অন্যায় বলে মনে করে না। তবে বীণার মা টুকুন বুবুনের জন্য যা করেছিল, সেজন্য তিনি এখনও বীণার মার কাছে কৃতজ্ঞ। নইলে তাঁর পক্ষে একা একা সন্তান এবং চাকরি সামলানো সহজসাধ্য হত না।

ততদিনে সোনালীর বিয়ে হয়ে গেছে। সোনালী নিজের পছন্দ করা ছেলেকেই বিয়ে করেছিল। সোনালী একদিন বিকেলে দেবাশিসকে সঙ্গে করে হাজির হল। বৌদি, দাদাকে একটু বলো, দেবাশিস এসেছে। মনীষা ভেতরে ভেতরে হেসেছিল, এখন বৌদির কাছে আসতে হয়েছে। এমনি তো সোনালী বড় একটা বৌদি বলে ডেকে কথা বলে না।

তিনি সমীরকে বলেছিলেন—

সোনালীর এক বন্ধু এসেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

কে? কেন? বলতে বলতে সমীর পড়ানোর টেবিল থেকে উঠে এসেছিল। সামনের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

মনীষা একবার চা দিতে গিয়েছিল। তখন শুনেছিল সমীর বলছে—

ওর একেবারে ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছেন, ওর বয়স তখন বছর চারেক একটু জেদী হয়ে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে।

দেবাশিস হাসি মুখে বসে ছিল—সার্থকতার হাসি। তারপর সমীর বাবাকে বলেছিল। বাবা অরাজী হন নি। দেবাশিস ছেলে ভালো। শিলিগুড়িতে ওদের ব্যবসা আছে বাপ ঠাকুরদার আমলের। জাতে গোত্রে মেলে। তখন এসব খুবই দেখা হত। সোনালীর ক্ষেত্রে হয়ত সোনালীর দাদা বাবা একটু নরম হতেন। তবে সব কিছু ঠিকঠাক থাকায় খুবই সহজ হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা,খুব ধুমধাম হয়েছিল বিয়েতে। দেবাশিসের বাড়ীর অনেক লোকজন এসেছিল। মনীষার সব সময়ই ভয় ভয় করছিল, কি জানি কখন কোথায় কি ভুল হয়ে যায়।

সোনালী দেবাশিস অসুখী হয়নি। সুখী হয়েছে একথা বোধহয় বলা যায় না কারো সম্পর্কেই। অসুখী হয়নি এইটুকু বলতে পারাই যথেষ্ট, যথেষ্টর বেশী। ওদের পরস্পরের স্বাভাবগত মিল আছে বেশ। দুজনেই বেশ হাসিখুশী হৈ চৈ স্বভাবের, মাঝে মাঝে ওরা প্রকাশ্যেই ঝগড়াঝাটি করে,যা তিনি বা সমীর কখনোই করেন নি। ওদের দুই ছেলেমেয়ে টিংকু আর রাজাকেও খুব ভালো লাগে। রাজা বা টিংকু কেউই অবশ্য পড়াশোনায় বিশেষ ভালো হয় নি। তবে দেখতে ভালো টিংকু তো রীতিমত সুন্দরী। সে তুলনায় টুকুন বুবুন খানিকটা নিরেস বই কি। টুকুনের রং তো বেশ চাপা। বুবুন বরং খানিকটা পিসির চেহারা পেয়েছে।

বুবুনকে দেখতে ভালোই বলা চলে।

টুকুন বুবুন বড় হয়ে উঠলো। একটু একটু করে একটা শিশু কেমন করে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে তিনি খুব মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। টুকুন একদিন কোথা থেকে মুচকি হাসি কথাটা শিখে এসে বলল—

মা তুমি একটু মুচকি হাসো তো।

তাই শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। একদিন একটা পেয়ারা খেতে খেতে টুকুন বলল, মা এই পেয়ারাটা কি করে তৈরী হয়েছে?

'পেয়ারাটা একটা পেয়ারা গাছ থেকে হয়েছে। তিনি বলেছিলেন।

সেই পেয়ারা গাছটা কোথা থেকে হয়েছে? টুকুনের তখন পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জিনিষের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই পেয়ারা গাছটা আর একটা পেয়ারা থেকে হয়েছে, তিনি বলেছিলেন।

আসল পেয়ারাটা কোথা থেকে হয়েছে তাই বলো না। টুকুন বিরক্ত হয়ে বলেছিল। আর একদিন বলেছিল, মা আমাকে তো তোমার পেট কেটে বের করেছে, তুমি কোথা থেকে হয়েছ?

আমাকেও আমার মায়ের পেট কেটে বের করেছিল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

তোমার মা কোথা থেকে এল?

আমার মায়েরও মা ছিল।

আসল মা-টা কি করে হয়েছিল বলো না। এমনি সব প্রশ্ন ছিল টুকুনের। মাঝে মাঝে তো ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশ মাথা ঘামাতে হত আমাকে। কিন্তু তাহলে কি হবে, লাজুকও ছিল খুব। ওকে স্কুলে ভর্তি করা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। যে স্কুলে আমি ভর্তি করতে চেয়েছিলাম, সেখানে ও এমন কি নিজের নামটাও বলে আসে নি, কেঁদে পালিয়ে এসেছিল। ছেলেবেলায় তো পরীক্ষায় কখনোই সব প্রশ্নের উত্তর দিত না।

সমীর ভীষণ রেগে যেত। কাজকর্মে সমীর নিজে খুব পরিপাটি গোছালো স্বভাবের ছিল এবং অন্যদের কাছ থেকেও সেই রকম নিখুঁত কাজকর্ম প্রত্যাশা করত। কিন্তু তিনি জানতেন টুকুন তাঁর স্বভাব পেয়েছে, টুকুন কোনোদিন হিসেবী গোছালো হবে না। ও যার স্বভাবে থাকে না,সে শত চেষ্টায় হয়তো একটু উন্নতি করতে পারে, কিন্তু একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতে পারে না কখনোই। খুব ছেলেবেলা থেকেই টুকুনের মনটা খুব নরম। ছেলেবেলায় সহজেই কেঁদে ফেলত। একবার মনে আছে, কি কারণে তাঁর শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। তিনি চুপ করে শুয়েছিলেন। টুকুন খেলতে খেলতে এসে বলল—

মা, তোমার কি হয়েছে ?

অসুখ করেছে বাবা।

মা তুমি মরে যাবে না তো।

বলে টুকুন কেঁদে ফেলেছিল। এইজন্যে,শুধু এইজন্যেই বুঝি তিনি এতকাল অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর তাই মনে হয়েছিল, ততদিনে তার ছেলেবেলার দুনিয়া প্রায় শূন্য হয়ে এসেছিল।

মা নেই, কুশলও নেই।

কুশলের স্মৃতি এখন ব্যথার মত মনে পড়ে। আর কোনো যন্ত্রনা নেই। এখন তো মোটামুটি এক রকম করে জীবনের মানে বুঝে নিয়েছেন।

কিন্তু সেই সময়ে সেইসব দিনে এত সহজে মেনে নিতে পারতেন না। কুশলের স্মৃতি কাঁটার মত বিঁধে থাকত।

টুকুন বড় হয়ে উঠছিল। টুকুন স্কুলে যায়, স্কুল থেকে আসে। বড় লাজুক আর নরম ছেলে। সমীরের বকাবকি খেতে হয় টুকুনকে আনস্মার্ট বলে। বরং বুবুন তার বাবার মনপছন্দ মেয়ে। ভারী হিসেবী, ভারী গোছালো। এমন কি বুবুন হাতের কাছে থাকলে তাঁরও বড় সুবিধে হয়। তিনি তো মুহূর্তে মুহূর্তে জিনিস হারান, কোথায় কি রেখেছেন খুঁজে পান না। বুবুন ঠিক মনে করে রাখতে পারে। যত বড় হয়েছে, তত যেন বুবুন আরো বেশী করে বাবার মেয়ে হয়ে গিয়েছে। তাঁরা যেন বাড়ীর মধ্যেই দুটো দল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আর টুকুন, বুবুন আর তার বাবা।

মাঝে মাঝে তার নিজের বাবার কথা মনে হয়। তত দিনে তাঁর নিজের অতীত স্মৃতি হয়ে আসছে। তবু মনে পড়ে, বড় বেশী করে মনে পড়ে।

শেষ বয়সটায় বাবা বড় একা হয়ে গিয়েছিলেন। দুঃসহ একাকীত্বে বাবার ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। দুএকবার যখন বাবার কাছে গেছেন তাঁর বুকের ভেতরটা দুমড়ে গেছে। তিনি চেয়েছিলেন বাবাকে নিজের কাছে এনে রাখতে, পারেন নি। বাবা আসতে চান নি। জামাইএর বাড়ীতে এসে থাকাটা অসম্মানজনক মনে করেছেন। মেয়ে হয়ে জন্মানোর দুঃখ আরো একবার পরিতাপ হয়ে তাঁর বুকে বিঁধেছে। শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা যে শেষকটা দিন বাবার কাছে থাকতে পেরেছিলেন। মাঝে মঝে বাবার কাছে বসে থাকতে থাকতে তাঁর চোখে জল এসে যেত। মা নেই, কুশল নেই, বাবাও থাকবে না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত মানুষকে হারিয়ে ফেলতে হয় জীবন থেকে।

শেষ দিকটাতে বাবা বলতেন, মনু, আমার তো এই জীবন শেষ হয়ে গেল,

হয়তো অন্য কোথাও জন্মাব। আমার খুব ভাবতে ভালো লাগে আবার জন্মেছি আবার স্কুলে যাচ্ছি, আবার কলেজে পড়ছি। আড্ডা দিচ্ছি হৈ হৈ করে। এই জীবন আর টেনে বাড়িয়ে কি লাভ ?

বাবার কথা শুনে তাঁর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠেছিল, সত্যিই কি জন্মান্তর আছে ? কে জানে ? বাবার কথা শুনে সেই দিন তাঁর মনে হয়েছিল জন্মান্তরে বিশ্বাস মানুষের একটা মানসিক আশ্রয়। নইলে বোধহয় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে মৃত্যুর কাছে এগিয়ে যাওয়ার বোঝা মানুষ বইতে পারত না। একদিন বাবা হঠাৎ বলেছিলেন—

মনু, তোমার মাকে আমি সুখী করতে চেয়েছিলাম। কোনদিন ইচ্ছে করে আমি তাঁকে কোন দুঃখ দিই নি, তবে কেন তাঁর হঠাৎ হার্টের অসুখ হল ? কোনো গোপন দুঃখ কি তাঁর ছিল ?'

মাকে সত্যিই তিনি কোনোদিন সেরকম অসুখী দেখেন নি, যেমন অসুখী তিনি নিজে ছিলেন সমীরকে নিয়ে।

না, বাবা, মার কোন দুঃখ ছিল না। হার্টের অসুখ আরো কত কারণে হয়। মা যে ভীষণ তেল ঘি ভাজাভুজি খেতে ভালোবাসতেন।

বরং তিনি বাবাকেই মনে মনে জিজ্ঞাসা করেছেন—

বাবা, আমার চিরদিন মনে হয়েছে, তোমার একটা কোন গোপন দুঃখ আছে। কি সেই দুঃখ ? মনে মনে জিজ্ঞাসা করেছেন, সামনাসামনি করতে পারেন নি। কেমন যেন লজ্জা করেছে।

মাকে সত্যিই তিনি সেরকম অসুখী কোনোদিন দেখেন নি। স্বামী কন্যা নিয়ে তিনি এক রকম পূর্ণতা পেয়েছিলেন। যে পূর্ণতাই একমাত্র মানুষকে সুখী করে। তিনি নিজে কোনোদিন সুখী হতে পারলেন না। তার জন্য তিনি মনে মনে সমীরকে যতই দায়ী করুন না, এ-ও তিনি জানেন, এই অসুখের শেকড় তাঁর নিজেরই ভেতরে। তিনি কখনো পূর্ণতা পাননি,অপূর্ণতার অসন্তোষ সর্বদাই তাঁকে ভেতরে ভেতরে পুড়িয়েছে। তাই তিনি নিজেও সুখী হন নি এবং হয়তো তাঁরই কারণে সমীরও সুখী হতে পারে নি। হয়তো একজন সহজে সুখী, সহজে সন্তুষ্ট স্ত্রীর স্বামী হলে সমীরও তৃপ্তি পেত। সংসার থেকে যেটুকু আনন্দ তিনি পেয়েছেন, তা তাঁর সন্তানদের বড় হয়ে ওঠার আনন্দ। টুকুনের মধ্যে তিনি নিজেকেই দেখতে পেতেন। একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর তার দশ বছর বয়স থেকেই টুকুন তাঁর সঙ্গী হয়ে যেতে পেরেছিল। টুকুনকে বই পড়ে শুনিয়ে তিনি নিজেও আনন্দ পেতেন। বুবুনের সব খেলায় তিনি

সব সময় ঠিক সঙ্গ দিতে পারতেন না। কিন্তু টুকুনের সঙ্গে তাঁর একধরণের সখ্যতা ছিল। এবং সেই সখ্যতাই তাঁর বেঁচে থাকার উপজীব্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আর এইভাবেই তো কাটিয়েও দিলেন। কত বছর কেটে গেল এই বাড়ীতে। প্রথম যখন এসেছিলেন সোনালী, সমীর আর সমীরের বাবা। তারপর সোনালীর বিয়ে হয়ে গেল। সমীরের বাবাও একদিন চলে গেলেন। আর গত দুবছরের মধ্যে তো গোটা জীবনটাই পালটে গেল। বুবুনের বিয়ে হয়ে গেল। আর বুবুনের বিয়ের ঠিক একমাস সতেরো দিন পরে সমীরও চলে গেল। সমীরের থাকাটা কোনোদিন যেন তেমন হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন নি। কিন্তু না থাকাটা পলে পলে অনুভব করেন। সংসারের কত খুঁটিনাটি ব্যাপারে সমীরই সিদ্ধান্ত নিত। তিনি তো সত্যি সত্যি কোনোদিন পরিপাটি গৃহিনী হতে পারেন নি।

টুকুনের স্কুলের শেষ পরীক্ষার কথা মনে পড়ে। খুব অমনোযোগী আর অসতর্ক ছাত্র তৈরী হচ্ছিল টুকুন। পড়ত, অসম্ভব পড়ত। কিন্তু তার কোনোটাই পড়ার বই নয়। অনেক বার টুকুনকে তার বাবা বলেছেন, ও রকম এলোমেলো পড়ার কোনো মানে হয় না, টুকুন।'

টুকুন মুচকি হেসে আড়ালে বলত, মা তুমি দেখো, আমি বাবার চাইতে ভালো রেজাল্ট করব।

আসলে সমীরের স্কুল ফাইন্যালের ফল ভালো ছিল না। অনার্স আর এম এতে অবশ্য খুবই ভালো ফল করেছিল। আর তার জোরেই চাকরি। সমীরকে অবশ্য নিজের বিষয়, অর্থনীতির বাইরে আর কোনো দিন বিশেষ কিছু পড়তে দেখে নি মনীষা। মনীষার রবীন্দ্রভক্তি নিয়ে অনেক সময় তো রসিকতাই করত সমীর। বুবুনকে বলতো—'তোর মাকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দে। সমীর চক্রবর্ত্তীর এই আস্তানায় তোর মার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কখনো বা বলতো—

আহা, গুরুদেব আর কটা বছর বাঁচলেন না। তাহলে তোর মার জীবন ধন্য হয়ে যেত, গুরুদেবও আর একটি শিষ্যা লাভ করতেন। আধুনিক কবিদের নিয়েও সমীর মাঝে মাঝে মেয়ের সঙ্গে মনীষাকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতা করত। কোনো কাজে দেরী হলে বা ঠিকমত কাজটা না হলে সমীর বুবুনকে বলতো, দেখগে যা, বোধহয় আজ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে। আর টুকুনও এই ব্যাপারে ধীরে ধীরে তাঁরই সঙ্গী হয়ে উঠছিল। দেশ-এ প্রিয় কবির নতুন কবিতা বা

পছন্দসই গল্প বেরুলে তিনি নিজে পড়ে টুকুনকে দিতেন। এরই ফল ফলেছিল, টুকুনের পড়ার বইএর চাইতে পড়ার বাইরের বই পড়াতেই বেশী মনোযোগ ছিল। তাই টুকুন যখন বলেছিল বাবার চাইতে ভাল ফল করবে, মনীষা মুখে কিছু বলে নি। কিন্তু মনে উদ্বেগ ছিল সদাসর্বদা। কি জানি কি হয়, কি জানি কি হয়। নিজের পরীক্ষার ফলের ব্যাপারেও বোধহয় তিনি এত আকুল হন নি। টুকুনের স্কুলের পরীক্ষার ফলের সময়ও এই রকম হয়েছে। টুকুন ক্লাশ পরীক্ষায় কখনোই ভাল ফল করত না। সমীর রাগারাগি করত। কিন্তু তিনি মনে করতেন, মনে আশা করতেন, স্কুলের শেষ পরীক্ষায় টুকুন নিশ্চয়ই ভালো ফল করবে। বলা চলে, টুকুনের ফল দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবেন এইরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর।

সেরকম তাক লাগানো ফল করে নি টুকুন। তবু মোটামুটি ভালোই করেছিল। সমীর খুব খুশী হয়েছিল, সমীর বোধহয় টুকুনের কাছ থেকে এটুকুও আশা করে নি।

বুদ্ধিমত্তায় বুবুন টুকুনের অনেক পেছনে, তিনি জানতেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল বুবুনেরই ভালো হত। তাই বুবুন সম্বন্ধেই তার বাবার আশা ছিল অনেক। পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসা টুকুনের ক্লান্ত ঘর্মাক্ত মুখ এখনো মনে পড়ে। একবার তিনি যেতে পারেন নি। সমীরকে পাঠিয়েছিলেন। টুকুন বাড়ী ফিরে বলেছিল—

মা, তুমি না গেলে আমার ভালো লাগে না।

তখনো এমনি ছেলেমানুষ ছিল টুকুন। বুবুন তাঁকে কখনো এমনি করে আঁকড়ে ধরে নি। বুবুন অবশ্য সবসময়ই বলত—

মা দাদাকে বেশী ভালোবাসে।

আর তার উত্তরে তিনি সব সময় বলতেন, মা কি কখনো কাউকে কম ভালোবাসতে পারে?

অবশ্যই মায়ামমতা দুজনের জন্যই সমান ছিল। অসুস্থ হলে দুজনের জন্যই সমান উদ্বেগ অনুভব করতেন। কিন্তু মায়ামমতার অতিরিক্ত যা ছিল, তা একটা অন্যরকম অনুভূতি, একটা মানসিক আশ্রয় যেন তিনি পেতেন টুকুনের কাছে।

বুবুনও তাঁর সন্তান। বুবুনের জন্য তাঁর মায়ামমতা ছিল, শাসনও ছিল। কিন্তু টুকুনকে তাঁর নিজেরই একটা অন্য অস্তিত্ব বলে মনে হত। তাই টুকুনকে তিনি কোনোদিন সেরকম কঠিন হয়ে শাসন করতে পারেন নি। আর সমীর টুকুনকে একটু বেশী শাসন করত বলেই বোধহয় তাঁর মন অপ্রতিরোধ্য ভাবে

টুকুনকে রক্ষা করতে ছুটে যেত। টুকুন অবশ্য কোনোদিনই খুব একটা বাবার শাসন গায়ে মাখত না। প্রতিবাদও জানাত না। যা করার তাই করে যেত। মনে মনে জানত মা তার পাশে আছে।

টুকুনের পরীক্ষার ফল যেদিন বেরুল, সমীরই নিয়ে এসেছিল খবরটা। ঢুকতে ঢুকতে বলল—

যাক, তোমার আদরের গোপাল ভালোয় ভালোয় উৎরে গেছে এ যাত্রা।

সমীরের মুখে খুশীর ভাব ছিল। খুব খুশী হলে তবেই সমীর টুকুনকে আদরের গোপাল বলে উল্লেখ করত। আর সেই সময় তাঁর বিশেষ করে মনে পড়ে গিয়েছিল নিজের পরীক্ষার ফল বেরুনোর সেই দিনটির কথা। বাবা টেলিগ্রাম হাতে করে ঘরে ঢুকে বললেন—

মনু, মনুমা। মাধুরী, মনুর পরীক্ষার ফল এসে গেছে।

মার খুশী মুখ, বাবার খুশী মুখ। খুব হাল্কা লাগছিল নিজেকে। এমন হাল্কা আর কখনো লাগে নি। কিন্তু সেইদিন জীবনের কতটুকুই বা জানা ছিল। কোনো সুদূরতম স্বপ্নে বা কল্পনায়ও কি এই দিনটির কথা সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন?

টুকুন তখন কিছু বলে নি, পরে জিজ্ঞাসা করেছিল –

মা, তুমি খুশী হও নি?

মনীষা হেসেছিলেন। টুকুন, সেদিনের টুকুন এখনও যেন পেটের মধ্যে, টুকুনের নড়েচড়ে ওঠার স্মৃতি বড় স্পষ্ট। সেদিনের সেই ছোট্ট টুকুন বড় হয়ে গেল। আনন্দ হচ্ছিল এবং কষ্টও হচ্ছিল। যেমন আনন্দ এবং কষ্ট হয়েছিল যেদিন টুকুন স্কুলে গেল সেদিন। আমার টুকুন, আমার বুকের ভেতরের টুকুন আলাদা অস্তিত্ব হয়ে গেল। কিছুদিন পর অবশ্য টুকুনের স্কুলের বন্ধুদের গল্প শুনতে ভারী ভালো লাগত। আর একটা মজার ব্যাপার ছিল টুকুনের। স্কুলের প্রত্যেক বন্ধুদের নামের মানে জানতে চাইত।

এক একদিন এক একটা নাম মুখে করে ফিরত।

মা অনির্বাণ মানে কি মা?

মা পারমিতা মানে কি মা?

মা গৌতম মানে কি মা?

শমীক মানে কি মা?

শমীক আর গৌতম এই দুটো নাম নিয়ে একটু অসুবিধেয় পড়েছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন শমীক মানে ক্ষুদ্র শমী বৃক্ষ। পরে চলন্তিকা খুলে দেখলেন

শমীক এক ঋষির নাম, তাই বলেছিলেন টুকুনকে। কিন্তু তাতেও ছেলে সন্তুষ্ট নয়।

ঋষির নাম তো, মানে কি বলনা। গৌতম বুদ্ধের নাম বলেও তৃপ্ত করতে পারেন নি ছেলেকে, শব্দ দুটোর মানে দরকার। শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছিল—

মানে নেই, ঋষিদের নামের মানে থাকে না।

পরে অনেকবার ভেবেছেন সেরকম কাউকে পেলে শব্দ দুটোর মানে জেনে নেবেন। আজো জানা হয় নি।

ছোটতে স্কুলে টুকুন ওইরকমই ছিল। স্কুলে যা কিছু খুঁটিনাটি হত, সবকিছু খুঁটিনাটি বলা চাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যতদিন স্কুলে ছিল এইরকমই ছিল। অন্য রকম হয়ে গেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর।

নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন জীবন। আস্তে আস্তে টুকুনের খেই হারিয়ে ফেলছিলেন মনীষা।

বুবুন বরং বড় হয়ে যাওয়ার পর বড় হয়ে যাওয়া শরীরের স্বাভাবিকতায় তাঁর কাছে ঘেঁষে আসছিল।

বুবুনের জন্মের পর থেকে সমীর আলাদা বিছানায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু বছর পাঁচেক বয়স হতেই বুবুন বাবার কাছে শুতে শুরু করেছিল। বুবুন ও তার বাবা, টুকুন আর তিনি। বহুবছর ধরে মোটামুটি এই নিয়ম চলে আসছিল। শুধু মাঝে মাঝে সোনালী তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলে অন্যরকম হত। বুবুন বড় হয়ে যাওয়ার পর সেই নিয়মটা পাল্টাল। বড় হয়ে যাওয়ার পর বুবুন মার কাছে চলে এল, টুকুন অন্য ঘরে, সমীর একা। এই ভাবেই তো কেটে গেল কতগুলো বছর। এখন আমিও একা। আমিও কি একা হয়ে যাব?

একটু আগে টুকুনরা চলে গেল। এখন তিনি একা। সারাজীবন ধরে এই একা হওয়ার ভয় ভেতরে ভেতরে যেন বই-এর পোকার মত তাঁর দিনগুলোকে কুরে কুরে কেটেছে। ভীড় তিনি কোনোদিনই ভালোবাসেন না। বাড়ীতে যখনই বেশী আত্মীয় স্বজন এসেছে, ভীড়ভাট্টা হয়েছে। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, পালাই পালাই। অথচ অন্তত একজন খুব কাছের মানুষকে জড়িয়ে থাকার ইচ্ছে তো মানুষের অন্তর্গত। বিশেষ ক'রে মেয়েরা বোধহয় একাকীত্বকে ছেলেদের চাইতে বেশী ভয় পায়।

টুকুন জয়িতাকে নিয়ে এসেছিল। সারাদিন থাকল। আজকালকার

ছেলেমেয়েরা অনেক স্পষ্ট এবং সোজা। জয়িতা স্নান করে এসে ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুণীটা হাতে তুলে নিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ বলল—

মাসীমা, আপনার আর স্পেয়ার চিরুণী আছে? তিনি প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি। মনে ভেবেছিলেন হয়তো তাঁর ব্যবহার করা চিরুণী মেয়েটা ব্যবহার করবে না। জয়িতা ততক্ষণে তার সুন্দর শ্যাম্পু করা ঘাড় পর্যন্ত ঝরঝরে চুলের মধ্যে লম্বা আঙুল চালিয়ে বলছে—

মাথাটা চুলকোচ্ছে, উকুন হয়েছে।

উকুন? তিনি ভীষণ অবাক হয়ে বলেছিলেন। ওইরকম ঝকঝকে সিল্কের মত চুলে উকুন তিনি কল্পনা করতে পারছিলেন না। উকুন বললেই ফুটপাত বাসিন্দাদের তেলহীন রুক্ষ ময়লা চুলের ছবি ভেসে ওঠে তাঁর চোখে।

অবাক হচ্ছেন? আমার মা-ও খুব রাগ করেন। কিন্তু কি করব বলুন, এখন ইউনিভার্সিটির কোন মেয়ের মাথায় উকুন আছে, আর কার নেই বলা যাবে না।

জয়িতার বলার ভঙ্গিতে তিনি হেসে উঠেছিলেন। টুকুনও হাসতে হাসতে বলেছিল—

উকুনওয়ালা মেয়ে বাবা আমি বৌ করতে পারব না।

জয়িতা চোখ পাকাচ্ছিল—

ঠিক আছে দাঁড়াও একখুনি যদি মাথা থেকে একটাকে ধরতে পারি, টুপ করে তোমার মাথায় একটা ছেড়ে দেব। তখন দেখব কে কাকে উকুনওয়ালা বলে! শুনে টুকুন বলেছিল—

দাও না, দাও। আমার মাথায় উকুন দুদিনও তিষ্ঠোতে পারবে না। আমার মাথা যা গরম!

তাই শুনে তিনি বলেছিলেন—

টুকুন একথাটা তুই ঠিক বললি না। তোর মাথা আবার কবে গরম হল? এত ধীরস্থির ছেলে তুই!

জয়িতা বলেছিল—

ঠিকই বলেছেন মাসীমা। ধীরস্থির কিন্তু দরকার হলে ভীষণ নিষ্ঠুর হতে পারে।

টুকুন রাগ করে বলেছিল, কবে আমাকে নিষ্ঠুর হতে দেখলে?

এখনও হওনি, তবে হতে পার। তোমাকে দেখলে আমার মনে হয়।

টুকুন চেঁচিয়ে বলেছিল, মা দেখেছ, তোমার ছেলের নামে কিসব যা-তা বলছে এই মেয়েটা।

আর তখন জয়িতা বলল—

বুড়ো ছেলে, এখনও মা মা করে নালিশ করে!

ভারী সহজ আর ঝরঝরে ছিল আবহাওয়াটা। কিন্তু জয়িতার কথায় কোথা থেকে যেন তাঁর বুকের মধ্যে অদৃশ্য কাঁটা বিঁধেছিল। সত্যিই তো টুকুন বড় হয়ে গেছে। এখন আর টুকুন শুধু তার নয়।

হাসতে হাসতে খুব আনন্দের পরিবেশেই খেতে বসেছিল সবাই। সারা সকাল ধরে শোভার মা আর তিনি রান্না করেছেন। এত বছর ধরে সংসার করেও তিনি সাংসারিক কাজকর্মে খুব পোক্ত নন। টুকুন খেতে বসে বলেছিল, আমার মার রান্না কেমন লাগছে।

তার উত্তরে জয়িতা বলতে পারত, খুব ভালো, বা ভালোই। তা না বলে জয়িতা বলেছিল, আমি অত রান্না খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাই না। যা পাই, তাই খাই। তুমি ঘামাও নাকি? আমি বাবা রাঁধতে টাঁধতে পারব না মনে রেখো।

তোমাকে কে রাঁধতে বলেছে, টুকুন বলেছিল। তুমি আবার রাঁধবে, সেই রান্না খাওয়া যাবে! তাহলেই হয়েছে।

বেশ তুমি তাহলে একটি রাঁধুনিকেই বিয়ে কর, জয়িতাকে গম্ভীর দেখাল। আমি কেটে পড়ছি নির্বিবাদে।

তিনি তখন বলেছিলেন, তোরা সব সময় এরকম ঝগড়া করিস, তোরা একসঙ্গে থাকবি কি করে?

জয়িতা বলেছিল—

আমাদের ঝগড়া করতে খুব ভালো লাগে, তাই না টুকুন?

হ্যাঁ মা। টুকুন হাসছিল। আমরা খুব ভালো ঝগড়া করতে পারি। তাই তো আমরা বিয়ে করব ঠিক করেছি। স্বামী স্ত্রী হওয়ার জন্য এর চাইতে বেশী যোগ্যতা দরকার হয় না। এটাই তো আমাদের একমাত্র কমন কোয়ালিফিকেশন। তাই না জয়িতা?

জয়িতাও হেসে ফেলেছিল।

তিনি বুঝতে পারছিলেন না কি বলবেন। শুধু চুপচাপ হাসছিলেন। জয়িতাকে এটা-নাও ওটা-নাও করে খাওয়াতেও সংকোচ হচ্ছিল। ও যেভাবে রান্না খাওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করল।

এমনিতে এত সহজ মেয়েটা। তবু তাঁর যেন কেমন সংকোচ হচ্ছিল। এত সহজ ভঙ্গীতে তিনি অভ্যস্ত নন। টুকুনও এমনিতে তাঁর সঙ্গে ঠিক এই ভঙ্গীতে কথা বলে না, যেমন জয়িতার সঙ্গে বলছে। এই টুকুন যেন তাঁর, তাঁর ঠিক চেনা

নয়। কত সহজ আনন্দে ঝগড়া করছে এই ছেলেমেয়ে দুটো। পঁচিশ বছর তিনি সমীরের সঙ্গে সংসার করেছেন। কিন্তু কোনোদিন ঠিক এমন করে ঝগড়া করতে পেরেছেন কি? মনে তো পড়ে না। রাগারাগি হয়েছে, দিনের পর দিন কথা বন্ধ থেকেছে। তিক্ততায় মন ভারাক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এমন আনন্দময় ঝগড়ার কথা মনে করতে পারেন না। বহু বছরের ঘনিষ্ঠ একত্রবাস এবং শারীরিক ঘনিষ্ঠতার ফলে নিশ্চয়ই এক ধরণের মায়া এবং নির্ভরতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এটা ঠিক, যে কোনোদিন তাঁরা খুব কাছাকাছি হতে পারেন নি। একটা দুরতিক্রম্য দূরত্ব শেষ দিন পর্যন্ত থেকে গেছিল।

এরা যেন অনেকটাই অন্যরকম। মনে হয় যেন কত সহজ এদের সম্পর্ক। জয়িতা ভারী ঝরঝরে স্মার্ট মেয়ে। সারাদিন থাকল। যাওয়ার সময় কেমন হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল—

আমাকে কেমন লাগল আপনার, মাসীমা?

ভেতরে একটা ক্ষোভ অথবা দুঃখ অথবা রাগ কাজ করছে, তিনি বুঝতে পারছিলেন। তবু হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন। কি বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। টুকুন জয়িতার মাথায় আলতো চাঁটি মারল—

খুব ফাজিল হয়েছ, না?

জয়িতাও ছাড়বার মেয়ে নয়। তার হাতে একটা কলম ছিল। তাই দিয়ে একটা খোঁচা মারল টুকুনের কপালে। মেরে বলল—

ফাজলামির কি দেখলে? সত্যি কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম।

টুকুন আর উত্তর না দিয়ে চলে গেল। হাসতে হাসতে জয়িতাও একটুজোর পায়ে হেঁটে টুকুনকে ধরে ফেলল। তারপর দুজনে একসঙ্গে হেঁটে চলে যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে তাকাল। টুকুন জয়িতা হাত নাড়ল দুজনে। পাশাপাশি ওদের দুজনকে হেঁটে চলে যেতে দেখতে দেখতে তাঁর মনে হল হয়তো এরা সুখী হবে।

সত্যিই কি সুখী হওয়া যায়!

তোমাকে ছুঁয়ে আছে □ অশোক মণ্ডল

তোমাকে ছুঁয়ে আছে এক যুবতীর তুমুল স্পর্ধা
পায়রা ওড়ানোর সহজ কুশলতায়
তুমি নির্বিকার উড়িয়ে দাও দু'হাতে
কবিতার ব্যর্থ পাণ্ডুলিপি
তোমাকে ছিন্নভিন্ন করার আগে দুষ্কৃতকারী হাওয়াও
থমকে দাঁড়ায়
হৃদয়ের অখণ্ড নীলিমায়
ফুটে থাকা নক্ষত্রের স্নিগ্ধ কুসুম
কেড়ে নেবার দুঃসাহস হারায়
তুমি যেখানেই যাও তোমার ছায়ার ভেতর
ছায়া হোয়ে হেঁটে যায় ভালবাসা
দু'পাশে সরে গিয়ে কুর্নিশ জানায় সিংহদরজার
রক্তচক্ষু পাথর
আগুনের ভেতর তুমি অনায়াসে আগুন হও
জলের ভেতর জল

তোমাকে ছুঁয়ে আছে এক যুবতীর তুমুল স্পর্ধা

ভাস্কর্য □ অশোক মণ্ডল

বুকের দুধ জমে জমে পাথর
অশ্রু জমে জমে পাথর
দুঃখকে দুঃখ দিতে
এইভাবে আর
নিজেকে কতো পোড়াবে
শোকের আগুনে?

স্বপ্নে বুঁদ একদা সেই
সবুজ কথারা জমে জমে পাথর
মৃত সন্তানের মতো অবিকল

শুয়ে আছে বুকের পাথরে।

ভুল পোষাকের ভিতর থেকে □ অশোক মণ্ডল

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে
চিনতে কষ্ট হয়, ভুল পোশাকের
ভেতর ডুবে আছি ? বেলা যায়—

শৈশব বড়ো দুঃখে আছে
কৈশোর বড়ো দুঃখে আছে
যৌবন বড়ো দুঃখে আছে

মানুষের কাছে আর যাবো না, মুখোশপ্রিয়
মুখগুলি চিনতে পারি না
মানুষের কাছে আর যাবো না, নিজের সঙ্গে
দেখা না করে কোথাও
যাবো না, কোথাও না—
বেলা যায়, সূর্যাস্তের পোশাক
তুলে নিয়েছি হাতে, যেন
শেষ মুহূর্ত টুকু ঠিকঠাক

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে
চিনে যেতে পারি।

ভুল অনুবাদ □ সুকুমার চৌধুরী

যাকে তুমি বিয়োগ প্রণালী ভাবো, প্রত্যাখ্যান
তা আসলে আলিঙ্গন, মিথুন প্রণয়
যাকে তুমি বিস্মরণ ভাবো, পরিত্রাণ
মূলতঃ তা গাঢ়গ্রন্থি, আমূল অন্বয়

দুরন্ত ছোবলে তুমি হোয়ে গ্যাছো নীল
তবু জানি ঈপ্সার গহনে ছিল বিকর্ষণস্পৃহা
ভুল অনুবাদে তুমি ভেঙেছো নিখিল
জড়িয়েছো পাঁকে পাঁকে যদিও অনীহা

দেবদূত ও শিশুভাসানের কাহিনী
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সমস্ত অভিজাত চরিত্রের ফাঁকে—যেন গ্রুপ ফোটো—
আমরা দেখতে পাই একজন দরিদ্র রুষ্ট ব্রাহ্মণকে
অনবধানে যার হোমধেনু
বধ করেছিল বসুষেণ,
দেখি, সে অভিশাপ দিচ্ছে, 'মর মর, ভা-রি যোদ্ধা হয়েছিস,
দেখবি, হাহাকার করতে হবে একদিন
যুদ্ধক্ষেত্রে বসে যাবে তোর দম্ভরথের চাকা।'
দেখতে পাই কর্ণের মুখে সেই ম্লান হাসি
অনিচ্ছুক গৃহস্থের গৃহত্যাগের মত করুণ তার
গর্বিত মাথার তনুত্যাগ।

কেউ বলে, আরো কয়েক শতাব্দী আগেকার প্রেক্ষাপট
কেউ বলে, না, অত প্রাচীন নয়,
খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক, যখন
প্রথম রচিত হয় মহাভারত। বেদব্যাস
মাত্র দশ হাজার শ্লোকে বর্ণনা করেছিল
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা। তারপর সেই পারিবারিক
সংঘর্ষের কাহিনী, কিছু কেচ্ছা
চারণ কবিদের মুখে ঘুরতে ঘুরতে জনপ্রিয়
অতিরঞ্জিত হতে থাকল
পল্লবিত হতে থাকল চরিত্রগুলি
সমসাময়িক অভিজ্ঞতার ছায়ায় নতুন নতুন উপাখ্যান
যুক্ত হল মহাভারতে।
বৈশম্পায়নের সময়ে চব্বিশ হাজার,
সৌতি চুরাশি হাজার শ্লোকে এবং

শেষ পর্যন্ত খিল হরিবংশ নামের কেউ
খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকে, অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের এপার-ওপার
প্রায় সাতশো বছর ধরে গঠিত হয়েছে আমাদের
এক লক্ষশ্লোকে ভারী ও বিচিত্র সেই উপন্যাস, যার নাম মহাভারত।

মীরাট ও কর্ণাল জেলার রাজবংশীয়
অভিজাত মানুষদের মহত্ত্ব শৌর্য ও দর্পহরণের কাহিনী
ধারাবাহিক দিগ্বিজয় আর খণ্ডযুদ্ধ
মাঝে মাঝে দেবকুলের হস্তক্ষেপ, দৈবসাবধানবাণী –
অতি বাস্তব ঘটনার পাশাপাশি অলৌকিক সব কাণ্ড
সারা ভারতের মানুষ প্রায় আড়াই হাজার বছর
ধরে পড়ছে। এই তাদের ঐতিহ্য।
ওরা প্রশ্ন করে না, গুটিকয় ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ক্ষত্রিয় যোদ্ধা ছাড়া
আর কারো কথা নেই কেন,
কেন নারী চরিত্রগুলি উপভোগে অপমানিত,
আলজিভে বিশ্বরূপ—সে কী রকম বায়োস্কোপ।
জানতে চায় না, শোকার্ত গান্ধারীর এক পলক দৃষ্টিপাতে
কী করে পুড়ে কালো হয়ে যায় যুধিষ্ঠিরের নখ,
বৃষকেতুর দু-টুকরো শরীর
জোড়া দেয় কোন্ ম্যাজিসিয়ান।
পক্ষপাতী ভগবানের ভয়ে ওরা নির্বাক।

কর্ণের কথা উঠতেই মনে পড়ে শিশু ভাসানের গল্প—
খেলতে খেলতে যদুনন্দিনী পৃথার দেহদান
(সূর্য বলে, এসে যখন পড়েছি, তখন
তোমাকে ভোগ না করে ফিরে যাই কী করে!)
আর কলঙ্ক লুকোতে নবজাতককে কাঠের পাত্রে স্থাপন করে
জলে ভাসিয়ে দেওয়া, বাঃ!
ভ্রূণহত্যার সহজ পথ তখন জানা ছিল না হয়ত, তবু
মানুষ-মায়ের এই হৃদয়হীনতা ক্ষমা করা যায়!
সারা জীবন, যাকে বলে ব্যভিচার তাই করে গেল কুন্তী
স্বামীর চোখের সামনে,

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সংসর্গে উৎপাদন করল
এক-একটি সন্তান, কেবল কর্ণই পেয়েছে লাঞ্ছনা।
খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মনুসংহিতার প্রভাব
থাকার কথা নয়, তবু হাওয়া
যেন সেদিকেই বইছিল :
সূতপুত্রের গ্লানি শেষ পর্যন্ত লালন করেছে কর্ণ।
অভিমানে প্রত্যাখ্যান করেছে রাজ সিংহাসন
স্ত্রী ও মানিবের প্রতি আজীবন থেকেছে বিশ্বস্ত।
কিন্তু কেন?
কেন সেই জারজকে পালক-পিতা অধিরথের পেশা
অশ্বশাসন ছেড়ে বার বার
ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুকরণ করতে উদ্যোগী হতে হয় :
দ্রোণাচার্য ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার শেখাল না,
পরশুরাম বহিষ্কার করে দিল,
তেজস্বী ধনুর্ধরকে প্রত্যাখ্যান করল দ্রৌপদী, তবু অবচেতনে
বংশগতিকে স্বীকার করার জন্য ব্যাকুল কর্ণ--
কৌরবদের আশ্রিত সেই বেতনভুক বীর—
জানত না, সে
ক্ষত্রিয় কিন্তু বুঝেছিল, সে একা, ওই অভিজাত প্রতিষ্ঠান
তাকে কর্তৃত্ব দেবে না কোনোদিন।
দেহ ছিঁড়ে আত্মরক্ষার অবলম্বন দুটি কবচ-কুণ্ডল
সমর্পণ করার সময়—কাকে সমর্পণ? কেন সমর্পণ?—
উদাসীন কর্ণ কেবল প্রার্থনা করেছে একাঘ্নী
কেবল অর্জুনবধের অধিকার। আর কিছু না।
এত বড় সম্মান! হাস্যকর। তার আগে
অনেক অভিশাপ ওর জীবনে জমা হয়ে গেছে।

আর এক শিশু ভাসানের গল্প আমরা জানি
তার নায়ক মোজেস
প্রাচীন ইহুদী ঐতিহ্যের প্রতীক—সে
মহাভারত রচনার এক হাজার বছর আগের কথা।

মিশরে তখন ফারাও বংশের রাজত্ব
প্যালেস্টাইন, সিরিয়া
মিশর-সম্রাট কর্তৃক অধিকৃত,
নীল নদের মুখে জলদস্যু অর্থাৎ ইউরোপীয়রা
পযুর্দস্ত হচ্ছে ফারাও সৈন্যের অস্ত্রে।
তারাই শোষণ করছে
দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ হিব্রুদের। পাছে
সম্ভ্রান্ত মিশরীয়দের চেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে ওরা,
সেই ভয়ে ফারাও
আদেশ জারি করে দেয়ঃ না,
কোনো হিব্রু পুরুষ-শিশুকে বাঁচতে দেওয়া হবে না।
ফারাওয়ের প্রহরীরা শহরে চক্কর দিয়ে ফিরছে দিনরাত
ঢুকে পড়ছে ঘরে ঘরে
টেনে বার করছে গৃহকোণে লুকোনো
নবজাত শিশু, আর আছাড় মারছে পাথরে।
মোজেস, এই রকম এক ফুটফুটে শিশু
লুকোনো ছিল তিন মাস
তারপর তার মা
দোলনাসুদ্ধ সন্তানকে ভাসিয়ে দিল
নীল নদে।
তাতে যদি সে বেঁচে যায়।

তাতে যদি বাঁচে, পিতৃপরিচয় ছাড়া
সমাজে যদি বেঁচে থাকে মানুষ—
এমন আশা ছিল কর্ণজননীরও, কিন্তু তার
পুত্র-বিসর্জন ছিল নিজ স্বার্থে। বরং
হত্যা এড়াতে বিপন্ন দেবকীর সন্তান বর্জন
রাত্রির অন্ধকারে কুন্তীরই দাদা বসুদেবের যমুনা অতিক্রম
যেন মোজেস-কাহিনীর সঙ্গে কিছুটা মিলে যায়।
পথ করে দিতে
লোহিত সাগরও শুকিয়ে গিয়েছিল হিব্রুদের দেশত্যাগের সময়।

আমরা শুনি, নিঃসন্তান ফারাও-কন্যা
হিব্রু শিশুটিকে আবিষ্কার করেছে নীলনদের তীরে
তুলে নিয়ে পালন করেছে রাজপ্রাসাদে। তার শিক্ষা-দীক্ষা
সম্পূর্ণ হয়েছে ফারাও আভিজাত্যের আলোয়, এবং
তার গায়ে সূতপুত্রের কলঙ্ক লাগে নি।
কিন্তু বড় হয়ে মোজেস স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল রাজপ্রাসাদ
ফিরে গিয়েছিল রক্তের সম্পর্কে। সে হিব্রু—
নির্যাতিত হিব্রুদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছিল প্রান্তরে,
যা কিনা বড় মাপের পুণ্য।
আমরা দেখি
গ্রীক গণতন্ত্রের সংবাদ নয়, সক্রেটিস নয়
মোজেস-জীবনের কঙ্কালসার
মিশর থেকে দুরতিক্রম্য পথে মহাভারতে প্রবেশ করছে—
তার আদর্শহীন গ্রাম্যতা আমাদের কষ্ট দেয়। বলতে পারো
অরণ্যবাসী ছিল বলে কি বৈদিক কবি
ব্যক্তিমানুষের সমস্যাই দেখতে পেয়েছে?
খুঁজেছে ব্যক্তিমানুষের পরিত্রাণ?
পাপী-তাপী মানুষকে উদ্ধার করতে নাস্তিক বুদ্ধকে আবির্ভূত হতে দেখি
মহাভারত রচনার দু'শ বছর আগে, তবু
মহাভারতে তার উল্লেখ নেই।
ভারতবর্ষের জনচিত্তে মানবপ্রেমের বাণী যখন ছড়াল
অশোক তখন ভারতসম্রাট,
আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট মিশর অধিকার করার পর
ভারতবিজয় শেষ করে
ব্যাবিলোনে ফিরে গেছে তার পঞ্চাশ বছর আগে।

প্রশ্ন জাগে
তবে কি সম্ভ্রান্ত মানুষের আশ্রিত কবি-কল্পনায়
ফিনিশিয় সভ্যতার খড়কুটো মাত্র উড়ে এসেছিল?
তবে কি সেই যবন আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রথম সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত?
গ্রীক বিজয়ীদের হাত ধরে, তাদের মুখে মুখে

এসেছে কি সমাজচেতনা,
দেশাত্মবোধ ও শিশুভাসানের কাহিনী ?
শোনা যায়
গ্রীক অভিযাত্রীদের অনেকে
এই বিচিত্র দেশে থেকে গিয়েছিল। তা হলে
পঞ্চনদের তীরে তাদের বংশধর কি প্রথম
অনুভব করেছিল
ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, বিষ্ণু অবতার না,
যম না,
অন্য এক সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপস্থিতি ?
যিনি সিনাই পর্বতাঞ্চলে দেখা দিয়েছিলেন এক সময়
মোজেসকে বলেছিলেন, 'যাও,
মিশর দেশে মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার চলছে
শুনেছি তাদের আর্ত চিৎকার,
যাও, তাদের উদ্ধার কর।'

আমরা বুঝতে চাই
ভগবান শুধু পক্ষপাতীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না,
তাঁর করুণা সমস্ত প্রাণীদের ওপর
সমভাবে বর্ষিত হওয়ার কথা।
নিরীহ নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ মানুষ—যারা কাজ করে,
যারা সহ্য করে ;
যারা কথা বলে না,
ইতিহাসে যাদের জায়গা হয় না কখনো,
তাদের দিকে তিনি তাকান ;
তাদের পথ দেখাতে ভগবানকে আসতে হয়,
তাদের অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠা করে যান।
আমরা বিশ্বাস করতে চাই—
যে-হেতু মানুষ স্বভাবত একক ও নিঃসঙ্গ,
হিংসুক ও প্রতিযোগিপ্রিয়, যে-হেতু
মানুষ স্বভাবত বৈষম্যবাদী, তাকে সাম্য ও সম্বন্ধন শেখাতে হবে।

দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তায় পঙ্গু এই দেশের মানুষ
আজও ভগবানের বাণী শোনে নি। নদীতীরে
আজও শিশুভাসানের জন্য দোলনা সাজায় তারা
তারপর মুখ ফিরিয়ে নেয়।
উদ্ভট মূর্তির সামনে ভয়ে-ভয়ে প্রণাম করে,
প্রার্থনা করে, ঠাকুর, রক্ষা কর, ঠাকুর রক্ষা কর।
এই সব মানুষের কি আর উদ্ধার হবে না কোনো দিন ?
তেত্রিশ শতক পার হয়ে গেল, তেত্রিশ কোটি না, একজন,
একজন মোজেস কি আর একবার নেমে আসবে না
সিনাই পর্বত থেকে ? মোজেস, যার অন্য নাম শুভ ?
এখন তো অনেক সহজ হয়েছে চলাচল।

এখন তো অনেক সহজ হয়েছে চলাচল।

তুমিও বিশ্বনাথ গরাই

যেভাবে ভাসালে তুমি আমাকে একাগ্র, ভীত থাকি
একচ্ছত্র এই অধিকারের জাহাজে কোনোদিন
যদি ষড়যন্ত্র ঘটে, তলদেশে প্রতিবেশী তিমি
ধারালো পাখার ক্রোধে যদি খোঁড়ে বিশাল গহ্বর !
এখন বাতাস শান্ত, অনুকূল ; প্রবাদ-প্রতিম
পাতালরহস্যগুলি মাঝে মাঝে বুদবুদ তুলে
সূর্যবন্দনার মতো আমাকেও করেছে কুর্ণিশ—
আমার দাস্যতা জমে পরিবৃত অতলান্ত সুখে ;

সুখের গন্ধের কাছে মাঝে মাঝে অতৃপ্তির মদ
নিঃসঙ্গ বেড়াতে আসে—যখন তা' অনুভবে ঢেউ
তোলে গাঢ়, তখন ফেরার রাস্তা বড় টালমাটাল—
ভেঙে পড়ে বন্দরের আলোস্তম্ভ, সুবর্ণ মাস্তুল ;
আমরা ফিরি না কেউ, কাঠের চিতায় ভেসে ভেসে
খুঁজি দ্বীপ—তুমিও বানাতে থাকো ভিন্ন পোতাশ্রয়।

মানবী আচরণ ও বিশ্বাসের অহংকার ▭ শ্যামল বসু

মানবী আচরণ। এ যেন কিছু ফ্রেমে ধরে রাখা নির্দেশনামা। সূত্র হিসাবে কিছু পুরাণ-এর উল্লেখ। এর বাইরে মনের মত, ব্যক্তি জনের প্রয়োজনে হিসাবষায় তার মর্যাদা রক্ষার প্ররোচনা। তাবৎ প্রাজ্ঞজন এই হিসাবে একমত না হলেও কারোর বোধহয় করার কিছু নেই। তাই ভালবাসার ভাব আর বিলাস—অহংকারের মোড়ক দিয়ে বছরের পর বছর ধরে প্রভাবিত করেছে মানবী আচরণ।

সৃষ্টি, গানগল্প নয়। একটা মানুষ তার মানুষী দায়ের দায়ভাগ মেটাতে গিয়ে এই সব 'স্থানীয়', 'জাতীয়' আর 'স্থূল' কিছু চিন্তাভাবনার গণ্ডিতে বার বার হোঁচট খেতে খেতে, নিজের কাজের যে বিন্দুতে তার পৌঁছানোর কথা, তার থেকে অনেক যোজন দূরে গিয়ে দিক নির্দেশ হারিয়ে ফেলে।

বিলাস নয়। কোন ব্যক্তিগত দুপুরের গল্প। পুরুষ আর নারী। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যে বাঁধন—তা হয়ত নয়, নিশ্চয় করে যে কোন নীতিবিদকে চিন্তিত করবে—যদি এরা হঠাৎ কোন অবসরকে তাদের তাবৎ মহাজাগতিক গতি থেকে সামান্য নিজস্ব করে নেয়। দুটি শরীর। প্রয়োজনের অবলম্বন হিসাবে একে অপরের মধ্যে যদি কিছু মুহূর্তের আশ্বাস খোঁজে—তাকে কী চ্যুতি বলা যায়? স্পর্শই কী মহাজাগতিক গতিকে ভেঙ্গে চুরমার করে, নির্মূল করে দেবার এতটাই ক্ষমতা রাখে?

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কোঠায় অনেক নড়বড়ে প্যাকিং বাক্স স্তূপ করে রাখা আছে। যাদের সঠিক হিসাব আমিও জানি না। তবে মুক্তি আর প্রগতি এই দুটি সংস্কারকে, বোধহয় নয়, নিশ্চিত করেই আমি জায়গা দিতে পারি নি। তাই মাঝে মাঝে যখন গতির প্রয়োজনে তাবৎ 'কসমিক' চেতনা কখনো সখনো বেচাল হয়, তখন তাদের নিয়ে কিছুটা যে আপ্লুত না হয়েছি তা নয়। তবে তাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব আমি কখনোই দিই নি।

জীবনপাত্র উহলিয়া মাধুরী করেছো দান। মাধুরীর রূপভেদ রঙ ভেদ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, বয়সকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো বা আছে, কারো বা নেই। যাদের নেই তাদের দলেই আমি। নিয়মের শাসনের মধ্যে এমন ব্যতিক্রম আমার প্রায়শঃই কাম্য। কিন্তু সমাজ আর

শৃংখলা যাকে বলা হয়, সভ্যতার অন্যনাম সংযম। সেই সংযমের কাছে কখনো যে আত্মসমর্পণ করিনি তা নয়। তবে ঐ টুকুই। এ নিয়ে মাথাব্যথা হবার খুব একটা কারণ দেখি না। কারণ স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি যেখানে মুখ্য, সেখানে সংযমের চৌকাঠ সযত্নে এড়িয়ে চলতে আমি জানি।

আর তোমার কথা। মানবীর সংস্কার বললে ভুল হবে। বলা উচিত মানুষী সংস্কার। দেশ কাল নির্ভর ক'রে, সামাজিকতার সিঁড়ি দিয়ে যেগুলো তোমাকে ছোঁয়। তাদের ছোঁয়া পেয়ে তুমি ভাব বানপ্রস্তই—উত্তর-চল্লিশের এক প্রোষিতভোর্তৃকার আশ্রয়। রূপ রঙের প্রতি আকর্ষণ যে তোমার একেবারেই নেই সেকথাটা কী জোর করে বলতে পার? বলতে পার হলফ করে, সামান্যতম সুখকে কেবল সংযমে আটকে রাখার মধ্যে দিয়ে কোন এক নির্দিষ্ট পূর্ণতার দিকে চলেছ তুমি? আমি জানি তোমার জানা নেই। আমি জানি এটা আমারও জানা নেই।

আধুনিক মানুষের কাছে ইদানীং কালের মূল্যবোধের লড়াই চলছে। বিদেশীয়ানার নকল নয়, সামগ্রিক ভাবেই নারীমুক্তির নজরকাড়া শ্লোগান। এই শ্লোগানের প্রভাবে মঞ্চ, বক্তৃতা সমাজসেবা, আরও অনেক কিছু। কুমারী মাতৃত্ব নিয়েও যথেষ্ট সোচ্চার কেউ কেউ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই!

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠির কথা মনে পড়ে। ১৯২৮ সালে ইউরোপের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে কবির অভিজ্ঞতা। চিঠিটা লিখেছিলেন তাঁরই বন্ধু কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়কে। চিঠির বক্তব্য ছিল—সেদিনের আধুনিক ইউরোপে মেয়েরা অর্থনৈতিক ভাবে স্ব-নির্ভর হয়ে উঠেছে। তাই তারা দাম্পত্য জীবনে দেহকে তেমন বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। বিবাহ নামক পেশাটা যেহেতু গুরুত্বের তুল্য-মূল্য বিচারে দিন দিন কমজোরি হয়ে পড়ছে—তাই সতীত্ব নামক মূলধন নিয়েও ওখানকার মেয়েরা ততটা চিন্তিত নয়। কারণ পেশা হিসাবে কেবল 'বিবাহ-বন্ধন' একথাটাকে তারা মেনে নেয় না। শিক্ষিত রুচিশীল মানবীর কাছে তার নিজস্ব সত্তার ভাললাগা মন্দলাগার গুরুত্ব বেড়েছে।

চিঠির অন্য অংশে আছে, প্রকৃতির যে নিয়ম, তার বিরুদ্ধাচারণ না করে রবীন্দ্রনাথের লীচু বাগানের থেকে দিলীপকুমার যদি লীচু আহরণ করে তাতেও তিনি (রবীন্দ্রনাথ) দোষ দেখেন না।

নারীর নারীত্ব—ও তার পূর্ণতা সন্ধানের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের

এই চিঠির প্রায় দশ বছর পরে লেখা ল্যাবরেটরি গল্পের নায়িকা সোহিনীর কাছে শোনা যাক। ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ সে হিনীকে দিয়ে স্পষ্ট বলাতে পেরেছিলেন তার মেয়ে নীলার বাবা অন্যত্র,সোহিনীর স্বামী মল্লিক নয়। ছোট অথচ এক নিদারুন সত্যের মুখোমুখি হয়েছিল তাবৎ বাঙালীয়ানার মূল্যবোধ। কিন্তু যা বাস্তব তাকে অস্বীকার করে লাভ কোথায়? নারী ও পুরুষের মূল সম্পর্ক সূত্র যেখানে তার দিকে কটাক্ষ করে মানবী আচরণ, বা তার মুক্তি কিংবা প্রগতি এক সংস্কারের বন্ধ জানালা।

অনুগত □ অচিন্ত্য নন্দী

বোগেনভেলিয়া ইড়িগ্ধি বাংলোয় বেগুনি আবির লেপে দেয়
বাংলোটা কুমারী মেয়ের লজ্জায় লাল হয়ে মুখ নিচু করে।
একটা খেজুর গাছ অন্য গাছের শরীরে ঢলে পড়ে যেন।
কালিনগর নদীতে ভাঁটার সময় কিনারা অশ্রুসজল।

আমার ভেতরে ক্যানিউট নেই, জীবনের প্রতি অনুগত।
স্থায়ী বসবাস হবে সমুদ্র সৈকতে, বিস্ময়ের মৃত্যু হবে।
অথবা আঁধার চোখ সয়ে যাবে একদিন, দৈনন্দিনতায়।
জীবনের দিকে চোখ রেখে পিছু হঠে গেলে সমুদ্র দেয়াল।

চলে যাচ্ছি, অপসৃয়মান লোকালয়, আমার খুচরো ব্যথা
রাস্তা বাঁক নিলে সমুদ্র চোখের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
অন্ধকারে ঢেউয়ের শাদা ফেনা ঈষৎ আলোয় জ্বলে নেভে
হাজার হাজার ডাইনোসেরস যেন অগভীরতায় ফুঁসে ওঠে

ট্যুরিস্ট সবাই ভেবেছে সমুদ্র এক সত্যিকার ড্রপসিন।
অন্ধকারে জল বাড়ে, দূরের জাহাজ শব্দহীন চলে যায়
মানুষেরা ক্রমে ডুবে যায়, একান্ত কাছের জন জলমগ্ন।
ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে, জলের গভীরে সমুদ্র সুষমা নেই।

মাছ অক্টোপাস আর হাঙরের মাঝে মানুষেরা বাঁচে
সমুদ্র আমাকে টেনে নেয়, আবার ফিরিয়ে দেয় মৃতদেহ।

ভালবাসা□শৌনক বর্মণ

ভালবাসা ফেলবে ফাঁদে ভাবিনি।
দেবার তার নেইকো কিছুই, কেবল
নেবার গোঁসাই তিনি!

দুঃখ আছে
সুখও আছে
আকাশ পাতাল ভাবনা আছে
আছে আশা—নিরাশায় ধিকি ধিকি জ্বলা
তবুও চলে যুগে যুগে আগুনে ঘি ঢালা।

ভালবাসায় সবই আছে।
এদিকে দুঃখ যেমন অপর দিক সুখ
ছুঁতে পারলেই পাওয়া আছে
হারিয়ে গেলে স্মৃতি আছে
কখনো খুশী কখনো বা ব্যথায় ভরে বুক।

অন্তর্গত আলো □ ভাস্করজ্যোতি দত্ত

কেন আরো গাঢ়তর আলোর সন্ধানে
চলে যেতে হয়?

মাঝরাতে অরণ্যে যেমন ক্ষিপ্র কোন আলোবিন্দু
যেদিকে গড়িয়ে যায় সেদিকেই পথ—

সবাই সেদিকে হেঁটে যায়
পথ চিনে নয় শুধু আলো চিনে চিনে।

বুকে নিবে গেলে আলো বুকের ভিতরেও কি কখনো
চিনে নিতে কষ্ট হয় খুব!

ছন্দে মিশে আছি ▭ রাখাল বিশ্বাস

শূন্য শাদা ললাট শিখরে
একদিন মাখিয়ে দিয়েছি লাল সিঁদুরের টিপ, আরো কিছু
ওষ্ঠ জুড়ে জড়িয়ে নিয়েছি ওষ্ঠ, প্রাণের গভীরে
যেই গান বাজতে বাজতে চলে গেলো
চেয়ে দ্যাখো তারো কোনো ছন্দে মিশে আছি
আছি ? নাকি কার্ণিসের রোদ ছিঁড়ে খায়
কদমের ছায়া
ঘুম আসে, ফিরে যায়, বুনো গন্ধে নেমে আসে জঙ্গলের চাঁদ
আমি এই উদাসীন ভিজে হাওয়ার মতন অন্ধকারে
নীল নীল দুঃখের মতন···

আলো, তারো বাইরের তীব্র এক আলো
উজ্জ্বল উজ্জ্বল সেই মঞ্জরিত রাত্রির আঁধারে
জেগে ওঠে অনন্তের স্তব্ধ বিশ্ব

শুধু তুমি
প্রোথিত সুখের কাছে চলে যেও, গিয়ে দ্যাখো
বিবর্ণ ঘরের মধ্যে পড়ে আছে অবেলার দীর্ঘ ব্যাকুলতা।

যাবে ?

অকথিত ▭ অজিত বাইরী

সবটুকু বলা হয় নি ;
সবটুকু বলাও হয় না।
যতটুকু বলা, বাকিটুকুর
কিছু থেকে যায় অন্ধকারে জোনাকির আলোয়।
কিছু থেকে যায় শীতে ও গ্রীষ্মে
গাছের স্খলিত পাতায়।

সবটুকু বলা হয় নি ;
সবটুকু বলাও হয় না।

ডানা ▭ সন্তোষ চক্রবর্তী

উনিশ বছর দীর্ঘ কবে হলো পার
আলোয় আঁধারে যথারীতি
এর নাম ভালোবাসা, এর নাম অলকানন্দার
স্মৃতি।

গভীর শিকড়ে যাওয়া
এবং নির্জন
সাধের শিমুলে ঘিরে কুল খুঁজে পাওয়া
স্বপ্নের বাহিরে থাকে।

উনিশ বছর পার করে দিলো তোমাকে আমাকে
পাহাড় অরণ্য
নদী।
ঘর নিবাসের নয়, শুধুই ফেরার জন্য।

ডানা মেলে উড়ে যেতে যদি।

তোমাকে খুঁজতে ▭ কল্যাণ রায়

রাত্রের জঙ্গলে তোমার নিবিড় গন্ধ
খুঁজেছি কতবার
বুক্ষে বুক্ষে করেছি কুঠার আঘাত,
ছোট পাহাড়ের ধারে
রেখেছি অস্ত্র কিছু পাতার আড়ালে,
পাঠিয়েছি চর,
বেষ্টিত করবো বলে
রচেছি দাবানল
ধরার মুহূর্তে সর্পদষ্ট যন্ত্রনায়
ডেকেছি তোমার নাম
চেয়েছি জল –

তুমি হাত ধরেছিলে মাত্র
দাও নি জীবন।

ঘর :

নুয়ে পড়ে সবুজ শিথিলতা
পুরু ধুলো জমে ওঠে অধরে
জঠরে স্পন্দন নিয়ে কোকিল
উড়ে যায় কাকের ঘরে

দুয়ার :

সার সার ইমারত আর
নীচে বয় দিনগত ক্ষয়
সিঁড়ি যত ছুঁতে চায় আকাশের স্পর্ধা
ছোট হয়ে আসে দুয়ার

লাজ :

লাজ রাখ লাজ রাখ লাজ
রাস্তায় আঁচলের আর্তি
দুহাত কানেতে ঢেকে
নত মুখ হেঁটে যায় সারথি

লজ্জা :

লজ্জা একি লজ্জা একি লজ্জা
কেঁপে উঠি সব নপুংসকের গর্জে
বাত ধরে যায় বীর্যবানের
ঠাণ্ডায় ঝিম্ মজ্জা

নদী :

দম্ভ কোরনা গর্ভিনী শ্রাবণে
আকাশ যদি নেমে আসে
তুমি আমার তোমার সন্তান
ভেসে যাবে তোমারই প্লাবনে

নালা :

টালীগঞ্জ থেকে টালা
গাঁইতি কোদাল বেলচা কাঁধে
নাব্যতা গেছে আনতে
হলধর সীতারাম মঙ্গনের থালা

বিষয় :

রাত দিন বিষয়ের বীজ
বুনে যাও আবাদী ও অনাবাদী
চাপান আর উতরোন সারে
বীজ বীজহীনতায় বিজ্ বিজ্

আসয় :

আমরণ কব্জি ডোবাও সুখে
সয় বা না সয়
বুকে জমে অধমর্ণ ঋণ
চুল থেকে নখ্ কেবলই আসয়

খেলা :

শহর জুড়ে চলছে খেলা
ট্রাপিজ আর স্ট্রিপটিজ
দোদুল্যমান এডাল ওডাল
পালক খোলশ খুলে ফেলা

ধুলো :

ধুলো আজ বড় ধুলোহীন
বুক ভরেনা আর বাতাসের শ্বাস
ওপরে কংক্রীট মেঘ অশ্লীল নিয়ন
পা বিঁধে দেয় বাহারী পলিগ্রাস

পথ :

পথের আড়ালে বাঁকে পথের শপথ
বুকে নিয়ে শ্বাশ্বত শোক
ভাবীকাল খুঁজে পায় সংযোগ
যে পথে গিয়েছিল পথ—বিজয়ের রথ

ঘাট :

নোলা জল ধুয়ে দেয় চিবুক বুক
জানলা দুখান খোলা হাট
নষ্ট শাখা জ্যোৎস্না মাখা
নিঃসঙ্গ হয়ে আসে ঘাট

হাওয়া, কেবলি ঘূর্ণায়মান হাওয়া ▭ দেবী রায়

অলক্ষ্যে, কেউ সুইচ অন করে দেয়
আর, উত্তর দিক থেকে
দক্ষিণ দিক থেকে
হাওয়া, কেবলি ঘূর্ণায়মাণ হাওয়া……
আমার সর্বাঙ্গ—এমন কি, আত্মার
অন্তঃস্থল অব্দি জুড়িয়ে যায়
এ সময় একটা সিগারেট মন্দ লাগতো না!
এদিক ওদিক যেদিকে-ই যাও
কম সে কম তিন কিলোমিটার
ঐ অ-তোদূর, হাওয়ার প্রবল অত্যাচারের ভিতর
কে যায়?
হাওয়া, কেবলি ঘূর্ণায়মান হাওয়ায়
মাথার জট-চিন্তা উড়িয়ে নিয়ে যায়
তার চেয়ে, এসো এই হাওয়ার রাতে
ধোঁয়া ছেড়ে, প্রাণভরে টানি হাওয়া……।

মায়া ও মমতা ▭ গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১. মায়া

সকল অহঙ্কার যেদিন শেষ হবে
সেদিনই মনে হবে
আকস্মিক চেতনায় শুধু জেগে আছে
জীবন ও পারাপারের স্বপ্ন
মনে হবে সুস্থ ছেলেবেলার ভুলে যাওয়া স্মৃতি
যা প্রতিদিন পোড়াবে ক্ষমায়

২. মমতা

কেন এই অচেতন সময় ভেঙে যাওয়া
কেন এই স্পর্শের আড়াল
যেভাবে রুমালের কোণের নকসা
সরল বিস্ময়ের সাক্ষী হয়ে আছে
কেন এই সীমাবদ্ধ অক্ষমতা আজ
আজ কেন মমতার লোভী আবরণ

নির্বাসিত ছন্দ ▭ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'গদ্যের চাল পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের।'[১] গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে 'নাচের চাল' বলতে তিনি ছন্দ, ছন্দোস্পন্দ বা মিলের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি এভাবে তা বিশদও করেছিলেন: 'ভাবকে, কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ কবিতা থেকে ছাড়িয়ে নিলেই তা হয় সংবাদ, সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই'।[২] গদ্য ও পদ্যের মধ্যেকার এই প্রথাপ্রচল পার্থক্য দীর্ঘদিন আমাদের চেতনা আচ্ছন্ন করেছিল—হয়তো এখনো অনেকের মধ্যে এই চিন্তার প্রতি পক্ষপাত রয়ে গেছে। ফরাসী কবি ভালেরি বলেছেন, কবিতা একটি পৃথক ভাষা এবং শুধু পৃথক নয় তুলনামূলকভাবে গদ্য ভাষার চেয়ে শ্রেয় এবং শুদ্ধ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় একইরকমভাবে বলেন: 'গদ্য ও পদ্যের সমীকরণের চেষ্টায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ কৃতকার্য হন নি, কারণ দৈনন্দিন ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধ মতেই বিভিন্ন। এই প্রভেদ গদ্যের ও পদ্যের স্বভাবগত'।[৩] যাঁরা ফরাসী 'নতুন রীতির উপন্যাস' (নুভো রোম) পড়েছেন তাঁরা সুধীন্দ্রনাথ কথিত এই প্রভেদ খুঁজে নাও পেতে পারেন। আসলে দুটি রচনারীতিতে, আঙ্গিকে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের ফলে গদ্য ও পদ্যের সীমারেখা কখনও কখনও সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে মুছে গেছে।

সঠিকভাবে বলতে গেলে বাংলা ছন্দের প্রথম উদ্গাতা ভারতচন্দ্র যতিনির্ভরতার স্ফটিক কাঠিন্যকে সম্মানে মেনে নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। পয়ারভিত্তিক যথার্থ অক্ষরবৃত্তের সূত্রপাতও তাঁর। পরবর্তী বহুদিন সেই একই ছন্দের পূজারী ছিলেন কবিরা। যতির দাসত্ব থেকে বাংলা ছন্দকে মুক্তি দিয়েছিলেন মধুসূদন তাঁর বিখ্যাত অমিত্রাক্ষর ছন্দে—বলাবাহুল্য সে ছন্দে অন্ত্যমিল পরিত্যক্ত হলেও বেঁচে ছিল মধ্যমিল, ছন্দোস্পন্দ ও শব্দালংকার। এর পরে রবীন্দ্রনাথই প্রচলিত পয়ার, সনেট, মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর ঘটালেন—গদ্যছন্দের সূচনাও রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'ছন্দসরস্বতী' হিসেবে গৃহীত রবীন্দ্রসমসাময়িক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বহুবিচিত্র ছন্দের আমদানী করলেন বাংলা

কবিতায়। রবীন্দ্রপরবর্তী কবিতায় বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন ঘটল। 'গদ্য কবিতা নয়, মিল রেখেই কবিতার মধ্যে গদ্যকবিতার স্বভাবসঞ্চার করার দিকে আধুনিকেরা দৃষ্টি দিলেন'।[৪] কিন্তু অতিসাম্প্রতকালে অনেকের রচনাতেই ছন্দ নির্বাসিত। 'কাব্যের প্রধান বাহন ভাষার সেই সুনিয়ন্ত্রিত বেগাবিকশিত ভঙ্গি যার নাম ছন্দ'[৫] আজ তা ক্রমশ বাংলা কবিতা থেকে বিসর্জিত হতে চলেছে। কিছু কিছু এই মুহূর্তের কবি যদিও ছন্দে কবিতা রচনা করছেন তবু সাধারণভাবে এই প্রবণতা লক্ষ্যণীয় যে অনেক কবি ছন্দহীনতার পথে পরিক্রমা সুরু করেছেন—প্রবহমান গদ্যে কবিতা লেখার প্রচেষ্টা এখন তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী।

ছন্দসম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্তত বেশ কিছু কবিতায় ছন্দের প্রতি নিবিড় মনোযোগ নিহত করেছে আন্তরিক কাব্যবীজকে, ফলে সেসব কবিতা কৃত্রিমতাহেতু পরিত্যক্তও হয়েছে। ছন্দের দোলার প্রাথমিক আবেদন পাঠককে উদ্বেল করলেও নিরালা একান্তপাঠ কবির কাছে প্রার্থনা করে মেধামনীষাদীপ্ত আবেগময় হার্দ্য উচ্চারণ যা ছন্দময়তার হাত ধরে চলে যায় অনেক গভীরে। কবিচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত অণু অনুভূতি ছন্দের অনুরণনে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে, যেমন একদা বাল্মীকির কণ্ঠস্বর সেই বিখ্যাত স্মরণযোগ্য পংক্তিযুগল উপহার দিয়েছিল: 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং…'। এই মতের বিপরীতে আধুনিকতম কবি ছন্দের অন্য সংজ্ঞা নির্দেশ করেন—ছন্দ মানে অন্ত্য ও মধ্যমিল সমন্বিত পদসমষ্টি একথা তাঁদের কাছে গৃহীত নয়। সুরের রিমঝিম টান থাকলে যা 'marries dream with dream, flute with horn' তা একান্তভাবে টানা গদ্যে লেখা হলেও কবিতা। সাম্প্রতিক কালে নিতান্ত আটপৌরে সুরহীন গদ্যও কবিতার ভূমিতে প্রোথিত এবং কেউ কেউ খবরের কাগজ পড়া বা ফুটবল ম্যাচ দেখার মত করে কবিতা পড়তে হবে এমন মতও দিয়েছেন। প্রখ্যাত চেক কবি মিরোশ্লাভ হোলুব প্রাহা রেডিওতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: 'I like writing for people untouched by poetry; for instance, for those who do not even know that it should at all be for them. I would like them read poems as naturally as they read the papers or go to a football game'. এই আদৃত ও সমালোচিত কবি 'freest of free verse'-এ কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁরই কবিতার বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে একালীন কবি আনন্দ ঘোষ হাজরা প্রারম্ভিকাতে বলেন: 'বেশ কিছু কবিতা আমি

ছন্দে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি, যদিও হোলুব ছন্দমিলের পক্ষপাতী নন। আমি এই স্বাধীনতাটুকু নিয়েছি এজন্যেই যে, আমি দেখেছি কয়েকটি কবিতা ছন্দে অনুবাদ করলে ঘনবদ্ধ হয়ে জ্বলে ওঠে। ছন্দ বর্জন করলে এটা হয়তো সম্ভব হতো না'।[৬] পূর্বসূত্র ধরে বলা যায় ফ্রাঁসিস পোঁজ, স্যাঁ-জন পের্স, অঁরি মিশো প্রমুখ প্রখ্যাত ফরাসী কবিরাও টানা গদ্যে কবিতা লিখেছেন। হয়তো এঁদের কারো কারো প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই সাম্প্রতিকদের উপর পড়েছে—ফলে বাংলা কবিতা থেকে আজ ছন্দ নির্বাসিত।

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে প্রবহমান গদ্যে রচিত কিছু কবিতা রয়েছে। যার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' এবং 'একটি দিন', স্বয়ং সম্পাদকের 'বৃষ্টির দিন' এবং অরুণ মিত্রের 'অমরতার কথা'। টানা গদ্যকে কবিতারূপে চিহ্নিত করলে অনেকে এমন দাবী করতে পারেন যে উপন্যাস, ছোটগল্প, উদাত্ত বক্তৃতা, মন্ময় প্রবন্ধ কিংবা নাটকের কিছু অংশ তাদের কাব্যিক মেজাজের জন্যে কেন কবিতা বলে গৃহীত হবে না! এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজকের কবিকে নতুন করে কবিতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হবে! অথবা এ জাতীয় সমস্ত রচনাকে 'কাব্যিক পাঠ্যবস্তু' এই ব্যাপক শিরোনামে বেঁধে ফেলতে হবে।

যদিও অরুণ মিত্র তাঁর 'প্রান্তরেখা' কাব্যগ্রন্থে প্রচলিত ছন্দে কবিতা লিখেছেন কিন্তু তার পর থেকেই তাঁর যাত্রা গদ্য আঙ্গিকের কবিতায় বিশেষত 'ঘনিষ্ঠ তাপ' কাব্যগ্রন্থে এসে। তিনি একদা লিখেছিলেন: 'কবিতা লিখতে গিয়ে আমি বারে বারে তাদের (ছন্দ মিলের) কাছ থেকে বাধা পেয়েছি বলেই অন্য পথ ধরেছি। এখন তো আমার ছন্দমিলকে একটা সংস্কার মনে হয়।—মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনিবিন্যাসে করতে পারে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করতে পারে কবিতার। যে শব্দব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই, সেই শব্দ সে ঘাড় ধরে প্রায়ই ব্যবহার করায়। এবং মিলের জন্যে কবিতার বক্তব্য বিপথে চলে যেতে পারে'।[৭] ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'ছন্দহীন সহজ ভঙ্গিতে কান্তি আপনি জাগে, দেখা দেয় ভাবের সচ্ছন্দতা, আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি'।[৮] অরুণ মিত্রের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির আধুনিক সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে। যদিও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ছন্দহীনতার কথা কোথাও বলেন নি। মুক্ত ছন্দের গদ্যকবিতা এবং তার ছন্দোস্পন্দকে স্বীকার করেছিলেন বলেই 'লিপিকা'কে কাব্যগ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করতে চান নি।

কবিতার অবিরত পাঠক হিসেবে প্রশ্ন জাগে—মিলের জন্যে কবিতার বক্তব্য কি বিপথে চলে যেতে পারে? যে মিল এরকম কাজ করাবার চেষ্টা করবে তাকে বর্জন করা কি দুরূহ? স্বয়ং অরুণ মিত্র কখনো কখনো ছন্দের সঞ্চার করে গদ্যের বিন্যাস কি ভেঙে দেন নি? প্রতীক-গর্ভ চিত্রকল্পে তিনি কি অজস্র গদ্য লিরিক লেখেন নি? অনেক গৌণ ও অক্ষম লেখক প্রবহমান গদ্যের পিচ-ঢালা পথে সহজ ভ্রমণে এসে কবিতার ক্ষতি করে যাচ্ছেন না তো? কোলরিজের মতো যেমন বলা যায় 'Poetry of the highest kind may exist without meter' তেমনি একথাও বলা স্বাভাবিক নয় কি যে ছন্দ যতি মিলেও অসাধারণ ভালো কবিতা লেখা যায়? উপাদানের অভাব ঘটলে রূপায়ণের অসম্পূর্ণতা এসে যায় নাকি?

এসব প্রশ্নের উদাহরণনির্ভর অনুসন্ধানী গবেষণা হয়তো স্থির সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আপাতত একথা নিশ্চিত বলা যায়, ছন্দ নির্বাসিত হলেই কবিতার শিখা নির্বাপিত এমন চিন্তা নিরর্থক—আবার সেই সঙ্গে এও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে সার্বিক ছন্দে কিংবা ছন্দে কিছু ভাঙচুর ঘটিয়ে রূপময়ী ব্যঞ্জনাময়ী কবিতার উদ্বোধন করা যেতে পারে। গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেলে তা গদ্যলিরিক এবং এক্ষেত্রে সহযোগী হতে পারে অর্থালংকার। সমিল গদ্যের বিশেষ চর্চা বাংলায় না হলেও অন্য ভাষাতে হয়েছে—তবে লিরিক্যাল গদ্যের অজস্র উদাহরণ বাংলা উপন্যাসে, ছোটগল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে ছড়িয়ে রয়েছে।

১. 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (১ম পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ) ১৪শ খণ্ড পৃঃ ২৬৩।
২. রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ'।
৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত'।
৪. 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দীপ্তি ত্রিপাঠী, নাভানা দ্বিতীয় সংস্করণ।
৫. বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্য চর্চা'।
৬. মিরোস্লাভ হোলুব ও তাঁর কবিতা, আনন্দ ঘোষ হাজরা।
৭. 'পরমা' পত্রিকা, শরৎ হেমন্ত, ১৩৮৪।
৮. রবীন্দ্র রচনাবলী (১ম পঃ বঃ সরকার সংস্করণ) ১৪শ খণ্ড পৃঃ ২৭৯।

শালিখ — উজ্জ্বল ঘোষ

এই রিক্‌শা, যাবে? ছোকরা রিক্‌শাওয়ালাটাকে দেখে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। মামনের অ্যাড্‌মিশনের দিনেও এই ছেলেটাই নিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা চালায় ভাল।

ওহ্ মামন, তাড়াতাড়ি এস। কি যে কর না তুমি!

কেন মা?

কি এত দেখতে দেখতে আসছ শুনি?

হাঁসগুলোকে দেখছিলাম। ওরা আজ কোথায় মা?

কেন? কি হয়েছে?

দেখতে পেলাম না।

আর দেখতে হবে না। চল, এবার ওঠ। শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে হাত ধরে তুলি ওকে। মেয়েটা কি যে হালকা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। অথচ যতই বল, ঠিকঠাক কিছুতেই খাবে না। এই বয়সের অন্যসব মেয়েদের দেখ, রিঙ্কু, মিতা, বুবুন, ধরে তোলা যায় না। এদিকে বলতে নেই, শরীর তো ভালই সুস্থ। আমার মত পেটের গণ্ডোগোলও নেই, বাপের দিকটাই পেয়েছে। তবুও যে কেন এত রোগা! আর হবে নাই বা কেন, সমস্তটা সময় বই মুখে করে বসে আছে। খেলা নেই, ধুলো নেই, কিচ্ছু নেই। জিজ্ঞেস করলেই, কাল যে আমার পরীক্ষা মা।

কি আর বলব! গার্মেন্ট গার্লসে চান্স পেয়ে যাক তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত। নইলে আর দেখতে হত না। ওর বাবা তো সমস্ত দোষটা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েই খালাস। আর নিজে সারাটা দিন হলডুক মারছেন। অফিস, টুর, পার্টি লেগেই তো রয়েছে। তার ওপর আবার সাহিত্যচর্চা! সময় কোথায় ওর। নইলে অ্যাড্‌মিশন টেস্টের দুদিন আগে কেউ টুর নেয়। ওফ্! সে যে কি ঝামেলার দিন গেছে, মনে করলে এখনো বুক কাঁপে। যদিও এখন মনে হয় যেভাবে সবাইকে বলা কওয়া হয়েছিল, এমন কি সুধীনদাকেও পর্যন্ত, তাতে ওর হয়ে যেতই। অথচ না আঁচানো পর্যন্ত তো বিশ্বাস নেই।

মনটা খুশি হয়ে ওঠে। মেয়েটাও খুব—খুবই ভাল পরীক্ষা দিয়েছিল।

মামন আমার। সোনা আমার। আদর করি মেয়েটাকে। নরম নরম গালদুটোয় হাত বুলোই। বুকে টেনে নিই। সোনা মেয়ে আমার।

মা।

কি মা?

হাঁসগুলো আজ কোথায় মা?

কোন হাঁসগুলো?

ঐ যে আমরা যখন রোজ স্কুলে আসি, টিনুদিদিদের পাশের খালি জমিটায় চরে বেড়ায়।

কি করে বলব বল?

বল না মা। তুমি তো সব বলতে পারো। মামনের গলায় আব্দার। মেয়েটা খুব নরম। মায়া হয়। এত ভাল মেয়ে আমার, কপালে একটা চুমু খাই। ওর ধারণা ওর মা সব জানে। ভুলটা ভেঙ্গে দিতেও কষ্ট হয়।

ওদের হয়ত শরীর খারাপ করেছে, তাই আজ আর সকালে প্যাঁক্-প্যাঁক্ করতে বেরয় নি।

কেউই কেন বেরয় নি তাহলে? সবার শরীর তো একসাথে খারাপ হয় না।

হতেও পারে।

কেন মা?

কেন আবার, সবাই হয়ত একই খাবার খেয়েছিল। পেট খারাপ হয়েছে।

ও। চুপ করে যায় মামন। বুঝতে চেষ্টা করে। মনে মনে কষ্ট পায় বোধ হয়। ওকে পুরোপুরি ভুল বোঝাতে সায় দেয় না মনটা। সম্ভাবনার কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করি।

কিংবা হয়ত সবারই শরীর খারাপ হয় নি। দু-একজনের হয়েছে। আর সবাই রয়ে গেছে ওদের দেখতে। যেমন তোমার শরীর খারাপ হলে কি আমি বেরোতে পারি, বল? ওর পিঠে হাত বোলাই। সাঁ-সাঁ করে ঘুরে চলে রিক্সার চাকাগুলো। চারদিকে ভোরবেলার নির্জনতা। ছোট্ট এই জেলা শহরটার ঘুম এখনো ভাঙ্গে নি।

এমনও হতে পারে হাঁসগুলো সবাই মিলে আজ বেড়াতে বেরিয়েছে। মামনের দিকে তাকিয়ে বলি। ও টলটলে চোখদুটো তুলে তাকায়। চোখে যেন কিসের একটা ছায়া।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মা।

কিসের কষ্ট সোনা?

পরীক্ষার।

পরীক্ষা তো কি হয়েছে! অবাক হই।

হাঁসগুলো যে দেখতে পেলাম না।

হাঁস না দেখতে পাওয়ার সাথে পরীক্ষার কি সম্পর্ক? জানতে চাই আমি। কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

সম্পর্ক আছে মা।

কি সম্পর্ক বল?

বলব?

হুঁ বল। বলবে বলেই তো বলছি। আমার গলাটা বোধ হয় একটু গম্ভীর শোনায়। ও ভয়ে ভয়ে তাকায় আমার দিকে।

ওদের যে আমি প্রথম সেই ভর্তির পরীক্ষার দিন দেখেছিলাম! তারপর থেকে তো রোজই আমি ওদের দেখি। তুমি বলেছিলে আমার পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছিল। ওর গলাটা কেমন ভেঙ্গা ভেঙ্গা শোনায়। মেয়েটা খুব ভীতু হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। বড় হয়ে কি করে যে চলবে কে জানে! কে যে ঢোকায় এসব ওর মাথায়! আমার থুতনিটা টেনে ধরে—

আজ প্রথম ওদের দেখতে পেলাম না মা।

আমি হাসি ওর দিকে তাকিয়ে। বাবা একবার তোমার এই কথা শুনলেই হয়েছে। ওকে সাহস দিতে চাই। বলি, তুমি একটা বোকা মেয়ে। কিছু জানো না। এত যে ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, সবাই কি হাঁস দেখে আসে নাকি বাড়ি থেকে? তারা কি করে হয় বল?

আমি জানি না।

পড়াশুনো করলেই ফার্স্ট হওয়া যায়।

আমি তো পড়াশুনো করি।

ভালমত পড়াশুনো করলে ঠিকই ফার্স্ট হবে। এরজন্য এত চিন্তার কি আছে? আর এটা তো একটা ক্লাসটেস্ট।

অর্চনাদি তো বলেছে ক্লাসটেস্টের নম্বরই সব অ্যানুয়ালে যোগ হবে। তাই সবাইকে ভাল করে পরীক্ষা দিতে।

তা তো নিশ্চয়। খুব ভাল করে পরীক্ষা দেবে। কি, পারবে না? ওর চিবুকটা আমি তুলে ধরি। তোমার ভয় কিসের? তুমি তো এর আগে কত গণ্ডা ক্লাসটেস্ট দিয়েছ, হাফ-ইয়ার্লি দিয়েছ। এটা তো নতুন কিছু নয়।

তখন তো হাঁসগুলো দেখেছিলাম।

আবার হাঁস বলে। বললাম না, হাঁস-ফাঁস কিছু নয়। আসল হল পড়া। তুমি কি অংক ভালমত কর নি ?

তুমিই তো করিয়েছ।

তাহলে ?

বললে যে আমি কিচ্ছু পারব না।

ওতো রাগ করে বলেছিলাম। যাতে তুমি আরো বেশি অংক কর। এখন বলছি তুমি সব পারবে। আর নয়। এবার চুপ কর।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে মামন। মেয়েটাকে কেমন দুঃখী দুঃখী দেখায়। বড্ড চাপ পড়ে বেচারার উপর। মায়া হয়। অথচ চাপ না দিয়েই বা উপায় কি। যা কম্পিটিশনের যুগ এদের। এই তো সুদেবীর ছেলে হাই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েও কলকাতার সাউথ পয়েন্টে থাকতে পারল না। অন্য স্কুলে পাঠাতে হল। সুদেবীর কত দুঃখ। আবার পাশেই রমাদির মেয়ে যাদবপুর থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হল ফিজিক্সে। রমাদির কত আনন্দ! আর হবে নাই বা কেন, রমাদি যা কড়া। সমস্ত সময় ছিল একটাই ভাবনা—মেয়ের পড়াশুনো। এমনকি নিজেও মেয়ের সাথে পড়েছে। নিজের কলেজে পড়ানো চুলোয় যাক। এটা ঠিকই অতটা কেয়ার না নিলে হয় না। এখন থেকেই মামনটার প্রতি যত্ন নিতে হবে। ফার্স্ট যদিও হচ্ছে, তবে গাবর্মেন্ট গার্লসের মেয়েরাই তো সব নয়। আরো হাজার হাজার ভাল স্কুল আছে। তাদের হাজার হাজার···।

ও মা ? মা ?

উঁ ? কিছু বলছ মামন ?

একটা কথা বলব মা ?

হুঁ, বল।

বল তুমি রাগ করবে না ?

তা কি করে বলব ?

বল না। ওর গলায় আব্দার।

আচ্ছা করব না।

আমি যদি হাইয়েস্ট না পাই তাও রাগ করবে না তো ?

কেন ? হাইয়েস্ট পাবে না কেন ? আমার গলায় বিরক্তির সুর।

হাঁসগুলো নেই যে !

ওফ্! তুমি না ? যা ধর তা একেবারে ছাড়বে না। একেবারে বাবার মত। ছোট থেকেই। সেই দেড় বছর বয়সে একবার কি কারণে রেগে গিয়ে

আমার চুল মুঠি করে ধরেছিল। ওঃ সে কি রাগ মেয়ের! কিছুতেই খুলবে না। ওদিকে জোর করতেও পারা যাচ্ছে না, একেবারে কচি হাত। শেষ পর্যন্ত ওকে ছাড়াতে কাঁচি দিয়ে আমার চুল কেটে ফেলতে হল। এই রকম মেয়ের জেদ!

হাঁস দেখলে ভাল হয় তোমায় কে বলেছে ?

কেউ না।

তবে ? আমরা তো জানি জোড়া শালিক হচ্ছে পয়া। কোথাও যাওয়ার পথে যদি দেখা যায় তো ভাল হয়।

জোড়া শালিক মানে ?

একসাথে দুটো শালিক।

সত্যি ?

তাই তো জানি।

মামন চুপ করে যায়। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। আমি খুশি হয়ে উঠি। ওকে একটা জোড়া শালিক দেখাতে হবে।

তুমি বরং দেখ কোথাও জোড়া শালিক দেখতে পাও কিনা।

জোড়া শালিক ?

হুঁ। একসাথে দুটো। বলতে বলতে আমিও এদিক ওদিক দেখি। রিক্শাটা তখন সোঁ সোঁ করে ছুটছে। পোস্টাপিসের মোড়টা পেরলেই এদিকটা একদম ফাঁকা। দু-একজন বৃদ্ধ মর্ণিং ওয়াক করছেন। মাঝে মাঝে দু একটা চায়ের দোকানে কয়েকটা লোক। হুস্ করে একটা সাইকেল চলে গেল আমাদের পেরিয়ে। ওদের গাবমেন্ট গার্লসেরই একটা মেয়ে। মে-ফ্লাওয়ার গাছের ডালে কি ওগুলো, শালিক ? নাহ্! রিক্শাটা আস্তে আস্তে ডি. ই. ই. অফিস পেরিয়ে যায়। একটু সরে একটা পুলিশের জীপকে রাস্তা করে দেয়। এই ভোরবেলাতেও পুলিশ!

ও মা।

কি ?

ঐ দেখ শালিক।

দাঁড়াও দাঁড়াও, এই রিক্শা। রিক্শাটা আস্তে আস্তে থেমে যায়। কই ? ওঃ ও তো তিনটে।

চল। আমিও একটু হতাশ হই। কোঠারী ম্যান্সনের সামনেটায় অনেক চাল-গম ছাড়ানো থাকে। ওখানে অনেক সময় দেখা যায়। মামনকে সান্ত্বনা দিই।

সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার! রোজ তো কত সময়ই দেখা যায়। অথচ

আজকেই···। সেদিনই তো কলেজ থেকে ফেরার পথে, আমাদের সামনের মাঠটায় দেখি দুটো শালিক। তারপর সেদিন একতলা সেই বাড়িটার টিনের ছাতে। মামনটা চুপ হয়ে গেছে। কি জানি কি ভাবছে।

রিক্‌শা ছুটে চলে। ঘাসের ডগায় শিশিরগুলোর পরে আলো পড়ে চক্‌ চক্‌ করে। এখনো শীতটা পুরো যায় নি। ওর বাবা কি এখন উঠেছে? কে জানে। কলি নিশ্চয় এতক্ষণে চা করে ফেলেছে।

কি? মৌমিতার মা মামনের দিকে তাকিয়ে হাসেন। মৌমিতাকে নিয়ে চলেছেন স্কুলে। ওর সাথেই এক ক্লাসে পড়ে মৌমিতা। মামন হাত নেড়ে জানতে চায়, খুব অংক কষেছিস নিশ্চয়?

না রে। মৌমিতা বোকা সাজে। মামন ঘাড় ঘুরিয়ে হাসে। আমিও হাসি একটু ওর সাথে সাথে। রিক্‌শাটা ওদের পেরিয়ে যায় আস্তে আস্তে।

জানো, শুক্তিমা গত টেস্টে আমার থেকে তিন নম্বর কম পেয়েছিল মাত্র। মামন আমার দিকে তাকিয়ে বলে।

তাতে কি হয়েছে?

কয়েক নম্বর বেশি পেলেই ও আমায় ছাড়িয়ে যেতে পারে। দুশ্চিন্তায় মামনের চোখটা ছোট হয়ে যায়।

ও পাবে না।

ইস্‌। ওর বাবা বলেছে আমার চেয়ে বেশি পেলেই ওকে একটা সাইকেল কিনে দেবে।

আমিও তো বলেছি তোমায় সিমলা নিয়ে যাব।

সিমলা! সিমলা ও কবে গেছে। মামন রাগে ঠোঁট উল্টায়।

তুমিও তেমনি অনেক গেছ! দিল্লী, বোম্বে, গোয়া, গৌহাটী, শিলং, ভুটান, রাঁচি, পুরী—তোমার মত কেউই বেড়ায় নি।

মোটেই না।

ওটা কি পাখি? আঙুল দিয়ে আমি মামনকে দেখাই।

শালিক নয়। মামন ভুরু কুঁচকে দেখে। আমি ভেবেছিলাম শালিক।

শালিকদেরও কি আজ সবার শরীর খারাপ? মামন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

বলি, না দেখা যাকগে আজ জোড়া শালিক। আমার কেমন রাগ হয়ে যায়। তুমি একটু চেষ্টা করলেই সব ঠিক ঠিক করতে পারবে। তোমার না-জানা তো কোন অংক নেই। আমি মামনকে বোঝাতে চেষ্টা করি। বোকার মত

কেবল সিলি মিসটেক কোর না। ধৈর্য ধরে শুধু রিভাইস কোর একটু।

মামন ঘাড় নাড়ে। ক্লাসে গিয়ে কি করবে কে জানে! তার ওপর আবার আজ এই ফ্যাকড়া। ওদিকে শুক্তিমা যদি সত্যিই মামনকে ধরে ফেলে!

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি। মেয়েটা ইনটেলিজেন্ট তো কম না। শুধু একটু যা ফাঁকিবাজ। অবশ্য ওটাই একটা···মনে মনে ভাবি আমি। চারিদিকে শুধু কেবল কিচির-মিচির একটা আওয়াজ। অথচ কোথাও কোন পাখি নেই। আমার রাগটা যেন আরো শির-শির করে ওঠে। রোজ ভোরবেলা তো কত পাখির জটলা। খেলা করতে করতে একেবারে রাস্তার উপর চলে আসে। অথচ আজ দেখো। রিক্‌শাটা একটা ঝাঁকুনি খায় হঠাৎ।

দেখ দেখ মা—মামন চেঁচিয়ে ওঠে।

কি?

কাঠবিড়ালি।

ধুস্‌। কাঠবিড়ালিটা টুক্‌ করে গাছে উঠে পড়ে। রিক্‌শাটা পারুলদিদের বাড়ি ছাড়িয়ে যায়।

পিংকুটার কথা মনে পড়তেই হাসি পেয়ে যায় আমার। ওই আরেক জন। পারুলদির ছোটছেলে। স্কুল যাওয়ার নামেই নাকি একেবারে জ্বর এসে যায়। একদিন পারুলদি বকাবকি করাতে নাকি সারাদিন কিছু খায় নি। তারপর বাবা ফিরলেই গিয়ে বলেছে, বাবা তোমার তো এত ক্ষমতা। সরকারকে বলতে পার না স্কুলগুলোকে সব দশটা থেকে করে দিতে। পারুলদির গল্প শুনতে শুনতে আমরা হেসে মরি। এই বয়সেই ছেলে বুঝে নিয়েছে বাবার কত ক্ষমতা। সুতরাং যদি কিছু···।

মামন?

তোমার নাচের দিদিমনি সেদিন কি বলছিলেন?

বলছিলেন সাঁতার কাট বলে তুমি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়। রবিবার দিন তুমি সাঁতার কাটবে না।

ও। তুমি কি বললে?

কিছু বলিনি।

ভাল করেছ। আমি চুপ করে থাকি। মামনের কম্পলানটা আবার ফুরিয়ে গেছে। ওকে বলাও হয় নি।

মা?

উঁ?

শালিক কোথায় মা ?

এতক্ষণ তোমায় কি বোঝালাম ?

ও। মামন মুখটা নীচু করে। বোধহয় বুঝতে পারে। যেটার জন্য আমার কষ্ট হয়। আমাদের পাশ দিয়ে একটা ভ্যান-রিকশা চলে যায়। মামন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বাচ্চা বাচ্চা কতগুলো মেয়ে। মামন আগে যে স্কুলে পড়তো সেই শিশুনিকেতনে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে ও-ও যেত। ঢাল বেয়ে রিকশাটা বেশ সুন্দর গড়িয়ে যায়। আমি মামনের দিকে তাকাই। চুলটা আবার কেটে দিতে হবে ওর।

হাতে এটা কি হয়েছে ?

ছাল উঠে গেছে। মিঠির সাথে খেলছিলাম।

ওহ্। ওই আরেকটা মেয়ে! যা দুরন্ত ওফ্! মাঝে-সাঝে যখন আসে, সমস্ত ঘর একেবারে লণ্ড-ভণ্ড। দুরন্ত তো আমরাও ছিলাম। আমার তো আবার বন্ধু ছিল যত ছেলে। মাঠ, ঘাট আর পুকুর। তবে যা কিছু ঘরের বাইরে। অভি, সিদ্ধার্থ আর আমি। অভী বোধহয় এখন দিল্লীতে।

মা।

উঁ।

নেই।

ওঃ। আমি হাসি। রিক্‌শাটা কোঠারী-ম্যানসন্ পেরিয়ে যায়। এখনো দোকান পাট কিছু খোলেনি। মামনকে কাছে টেনে নিই। ওকে একটা চুমু খাই।

না থাকগে। তুমি আমার সোনা মেয়ে। আমার ছোট্ট সোনা। মামন নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

গাছটা কি সুন্দর দেখ। মামন আমায় আঙ্গুল তুলে দেখায়। আমি দেখি। সত্যিই বেশ সুন্দর। দু-তিনটে পাখি থাকলে আরো বেশ হত।

শালিক। আমার হাসি পায়।

দেখেছ ?

হুঁ। সত্যিই বেশ সুন্দর। যাওয়া আসার পথে তো রোজই দেখি। কি গাছ জানি না।

কি গাছ মা ?

জানি না।

বাবাকে জিগ্যেস করব আমি।

কোর। আমি না পারলে আছে ওর বাবা। বাবা-অন্ত প্রাণ। বাবার এদিকে সময়ই নেই যে মেয়েকে একটু দেখবে। তাহলে তো আমার আর চিন্তাই থাকত না। নতুন গির্জাটাও পেরিয়ে যায় রিক্‌শাটা।

আজ একটা নতুন খাবার করব, তুমি খুব পছন্দ কর।

কি ?

মাছের চপ্।

আমি খাব না।

তাহলে কি করব ? তুমি বল।

তুমি খেও।

তোমার জন্যই তো করব।

আমার ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে ?

কিছুই না।

তা বললে হয় নাকি ? মেয়েটা সত্যিই এই রকমই। কি যে ওর ভাল লাগে ? টিং-টিং করে আরো কয়েকটা মেয়ে চলে যায়। ওদেরই স্কুলের সব। ওই মেয়েটা তো রোজ গাড়ি করে আসে। আজ কি হল কে জানে! রিক্‌শাটা একটা বাঁক নেয়। এদিকটা আবার বেশ গাছগাছালি। মামনদের স্কুল তো প্রায় এসেই গেল। কি যেন একটা দেখছে মামন। কি দেখছে এত মন দিয়ে কে জানে।

কি দেখছ মামন ?

হাঁস।

বাবা! তাহলে শান্তি ?

এ তো অন্য।

ওহ্! তুমি না···। আমি চুপ করে যাই।

কি ?

কিছু না। মামন আমার দিকে তাকায়। আমারও কেমন যেন একটা দুঃখ হয়। আমি ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

আজ তাহলে তোমার জন্য প্রণ্ কাটলেট করব।

মামন হাসে। রিক্‌শাটা এসে স্কুলের গেটের সামনে থামে।

ভাল করে পরীক্ষা দিও।

মামন নেমে পড়ে। মধুমিতা ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। ওদের ক্লাসমেট্।

কি যেন বলে ওকে। কত হাসি খুশি মেয়ে। মামনও একটু হাসে। স্কুলের বাক্সটা নিয়ে আস্তে আস্তে গেট পেরিয়ে হেঁটে যায়। আমি নেমে দাঁড়াই। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে। মুখটা বিষণ্ণ। আমার সাত বছরের মেয়ে। কি যে ওর এত দুঃখ! আমিও হাত নাড়ি। ওর দিকে তাকিয়ে হাসি।

দিদি।

কি?

ঐ দেখুন।

আমি রিক্‌শাওয়ালা ছোকরাটার দিকে তাকাই। কখন যে আমার পেছনে চলে এসেছে। ও আমায় আঙ্গুল তুলে দেখায়। একজোড়া শালিক! রিক্‌শাওয়ালা ছেলেটার মুখে হাসি।

ডাকব?

না থাক। মামন তখন অনেকটা চলে গেছে। ওকে আর পেছনে ডাকা উচিত হবে না।

দর্পণের কাছে—দেবপ্রসাদ মিত্র

তবু যাই আমি মায়া দর্পণের কাছে
জেনেছি অলীক যাকে মেধায়, হৃদয়ে
পলি জমে তার অনুভবে।
পোড়ায় প্রবল খরা, ভাসায় শ্রাবণ
নদীর সন্ধানে আমি বারবার ভুলি পথ
অলৌকিক আয়নায় তখনই দেখি মুখ,
সংলাপ বলি নির্জনে– 'বলতো আয়না সুন্দরকে……'
অমনি বদলে যায় দৃশ্যপট ফেরে রূপকথা।

তামাসার ময়দানে পুড়ে গেছে শেষ বস্ত্রখণ্ড
দর্পণ গোপন করে লজ্জা প্রিয় বুকে তার;
প্রতিবিম্বে ভেসে ওঠে আমার সুবেশ সময়,
বুকের গভীরে বাজে অস্তিত্বের সামগান।

ফুলের জন্ম—দেবপ্রসাদ মিত্র

শুধু মাটির করুণা আর সৌর স্নেহ যথেষ্ট নয়
এমন কি অভিজাত জন্মের বীজও নয়,
সে এক অন্য প্রহর যখন নদীতে ঢেউ নেই
শান্ত পৃথিবীতে কোন সাড়া টাড়া নেই
অথচ বাতাস তছনছ করে দেয় লতাগুল্ম……,
তখন হঠাৎ শেষ হয় গুটি পোকার সময়
এবং একটি ফুলের জন্ম হয় ঘন রক্তপাতে।

দেখুন, দেখে যান—মতি মুখোপাধ্যায়

'আমায় দেখুন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে,
দু'চোখে যতটা সংশয় জমে থাকতে পারে
দেশলাই কাঠি জেবলে পুড়িয়ে নিয়ে,
পাইকারের মতো কানকো তুলে দেখে নিন
পরখ করে নিন পর্দা-টর্দা, চোখের জল
দেখে নিন কোথাও কোন ভাঁজে
জন্মান্তর লেপটে আছে কিনা।'

কথা শেষ হতে না হতেই যেন
সীমান্তিনীকে আড়াল করে গজিয়ে উঠল তাঁবু
সার্কাস সার্কাস
বাঁশ-চেরা গলায় কারা যেন বলছে
'আসুন, দেখে যান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের খেলা
অ্যাসিড কেরোসিন আগুন ও ঝুলন্ত দড়িতে
টাট্‌কা নোতুন খেলা
আপনাদের শহরে এই প্রথম, দেখে যান
দেখে যান স্যার মজাদার খেলা।'

সংসার—সংযম পাল

মহাপ্রলয়ের কালে
ব্রহ্মাণ্ডের লয়
তখন আবার আমিই প্রথম, আমার ভেতরে সব
গ্যাসেদের মতো লীন

প্রথম জগৎ প্রসুপ্ত ছিলো, তার
পরমাত্মাই সব
এছাড়া দ্বিতীয় বস্তু, ভ্রূণের চঞ্চল কোনো প্রাণ
আদৌ কোথাও নেই

মহানিশাঘেরা দুর্দম সেই নীরন্ধ্র সংকারে
সূর্যের মতো আমি
আমার বিরাট মূর্তি, আমার সৃষ্টি ক্রীড়ার শখ
কবিতার মতো মায়া

সহস্র মস্তক
সহস্র চোখ, সহস্র পা ও সহস্র স্বেদজ্যোতি
ব্রহ্মার পিতা, স্বামী
আমার দেহের অঙ্গ থেকেই পুনর্জীবন তার

ব্রহ্মার বাণী তুমি
আমার পত্নী, রহস্যময়ী, পুরবাসিনী ও পরী
আমার আগুন, কালো
বারুদের সংসার

পড়ুন
ভাস্বতী রায়চৌধুরীর কবিতার বই
একটি কি দুটি কেন সাত টাকা
জয়দীপ প্রকাশন ও অহংকার-এ পাবেন

আগুনের ডানা—প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

আগুনের ডানা সেই বিশল্যকরণী
মাথার ওপরে অর্জুন গাছের পাতা ঢেকে দেয় ক্ষত,
তবু ক্রোধ জ্বলে ওঠে তৃতীয় নয়নে—

মেঘের আড়ালে শিশুর পায়ের মতো চাঁদ,
নারীর সিঁথিতে সেই পদ্মঘ্রাণ
চামুণ্ডী পাহাড় অঞ্জলিতে ধ'রে আছে অর্ঘ্যের মুকুল
এখানে জাহ্নবী নেই, পাহাড়ী অরণ্য আছে,
আকাশ মহানুভবে নীল,
বন্য মেঘের ডানায় সূর্যের রক্তচেলী পরানো মেয়েটি
এক স্বয়ংবৃতা কনে,
বুকের একান্তে আছে ইয়োতির থাবা,

পাহাড়ের কালচে গুহায়
ফার্ণ পাতার গায়ে আলোর নোলক জ্বলে,
আগুনের পাখা মেলে আইকারাস উড়ে যায়
ধূসর গোধূলি নামে যেন এক নগ্ন নামাবলী।

তোমার লুণ্ঠন চেয়ে দেখি—ঈশিতা ভাদুড়ী

মৃদঙ্গের শব্দে, সমুদ্রের স্রোতে
তুমি-ই ভাঙ্গতে পারো আমার শৃঙ্খল।

তুমি আমাকে স্পর্শ করো,
আমি কেঁপে উঠি ভূমিকম্পের মতো।

বুকের মধ্যে সিঁদুরে মেঘ তোমার,
আমাকে দস্যুর মতো তুমি লুঠ করো,
আমি তন্ময় হয়ে চেয়ে দেখি
তোমার এই লুণ্ঠন।

পতাকা নামাও□সুব্রত সরকার

গলি থেকে ডেকে উঠি কু-স্বরে
পতাকা নামাও।
দেখছো না, গাছের পাতা পরে আছি।
তোমাদের লজ্জা করে না—যে স্তন
চুষে চুষে মস্তী হয়েছো
জন্মরক্ত আজ লাল আলো হয়ে জ্বলে এ্যামবাসাডারে

আমার যোনির গর্ত থেকে যে পাতালের শুরু
তুমিও সেখানকারই এক অবিনাশী কীট
শুধু ধানের বাতাসে আর ছাগলের পায়ে চলা পথে
এত বড় হয়েছো চুমুমুনু।

ভোট নয়, মাইয়ের বোঁটার ছাপে জিতে গেলি ধন
এবার পেট ভরে খাওয়া. আর
তোর গাড়িতে লাগানো ঐ ন্যাকড়াটুকু চাইছি
আমার লজ্জা ঢেকে দে।

তুমি□রণজিৎ দেব

ধু ধু নদীর জল ওপার দেখা যায় না
শুধুই একটি রেখা ভাসে
আকাশটা ছুঁয়ে আছে বলে ?
অথচ এইখানে নদী ছুঁয়ে আছে পার
ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে আছে
কী ভয়ংকর ভয়ংকর বলে বসতবাটি সরিয়ে নিচ্ছে মানুষ

তেমনি
তুমিও কি ক্রমে ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে আছো
ভেঙে দিচ্ছো এপারের পার
বাস্তুভূমি গড়িয়ে যাচ্ছে জলে
ওপারের ভালবাসার আকাশটা
ছুঁয়ে আছো বলে ?

আধার ভেঙেছে□আনন্দ ঘোষ হাজরা

অসংখ্য মৃত্তিকা অণু আগুনের মধ্য থেকে
বিশেষ ভঙ্গিতে উঠে আসে
অনন্ত আধার যেন ; অবয়বহীনতাকে ধরে
রূপ দেয়। যেমন আঙুর ধরে অশরীরী মিষ্টতা ও জল
প্রতিশ্রুতি রূপ পায় সমাহিত বিশিষ্ট আধারে।

কথা তো এমনই ছিলো…
অগ্নি পরিধিকে ছুঁয়ে এসেছিলে যে তরুণ বন্ধুরা আমার…

তরঙ্গভঙ্গুর শব্দ শুনি কেন নষ্ট হাওয়া জুড়ে ?
আধার ভেঙেছে নাকি, অণুগুলি পুণরায় মৃত্তিকা চিনেছে ?
লক্ষ্যহীন উপচে পড়ে জল… …

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ও সরকারী অনুদান গ্রহণ করে আপনার জলাশয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষের সাহায্যে অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি অফিস বা জেলা মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থার সাথে সত্বর যোগাযোগ করুন।

মৎসচাষী উন্নয়ন সংস্থা
কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ

ক্ষুধিতের ভাষা
বুকে ক'রে ক'রে
ফলিব কি! —পড়িব কি ঝ'রে
পৃথিবীর শস্যের ক্ষেতে
আর একবার আমি—
নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে।

—জীবনানন্দ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট
ব্যাঙ্ক লিঃ
২৫ডি, সেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৭
(সমবায় সংগঠনে কৃষি সরঞ্জাম ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ঋণের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান)
॥ আঞ্চলিক অফিস ॥
শরৎ বোস রোড, শিলিগুড়ি এবং নতুন পল্লী, বর্ধমান

Published by Sri Kali Kumar Chakrabarty on behalf of Ahankar, Calcutta-700033
Printed at Shib Sankar Press, 44, Sitaram Ghosh Street, Calcutta-700009
Rs. 4·00